জানা অজানা ১

সাধনা মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
বিধানসরণী ॥ কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রী[illegible]পদ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধানসরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১৩৬০

মুদ্রক :
শ্রীপরাণচন্দ্র রায়
সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মিনি তুনতুন রিনাকে

—মা

লেখিকার অন্যান্য বই

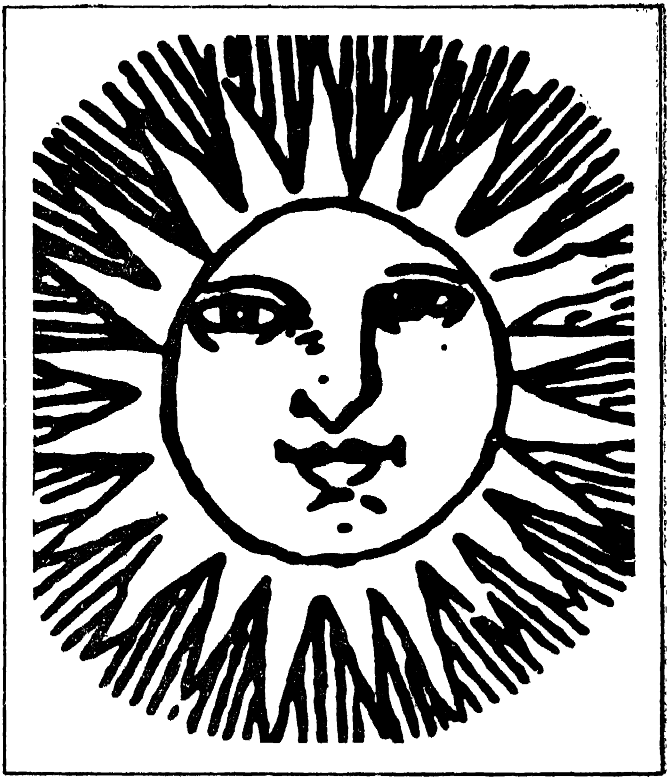
কাব্যগ্রন্থ :
আকাশ কন্যা
দোপাটীর ইচ্ছে
কুন্দ কদলী কৃষ্ণচূড়া
একদা রাজধানী
কবিতার আদালত
প্রত্যূষের ফুল
রমণী গোলাপ
প্রবন্ধ (ভৌগোলিক) :
পৃথিবী ঘুরছে
বিবিধ :
রান্না করে দেখুন

ভূমিকা

'আনন্দমেলা' পত্রিকায় যখনই পৃথিবী কিংবা আকাশের নানা রহস্য সম্পর্কে কিছু লেখাবার দরকার হয়েছে, তখনই আমি বিনা দ্বিধায় সাহায্য নিয়েছি শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায়ের। তার কারণ, একে তো এ-ব্যাপারে তাঁর তথ্যনিষ্ঠার কোনো তুলনা হয় না, তার উপরে আবার প্রকৃতিবিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়কে অত্যন্ত সহজ করে তিনি বুঝিয়ে বলতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোনও জুড়ি তো আমার চোখে পড়ে না। শ্রীমতী সাধনা এ-যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। কিন্তু গদ্যরচনাতেও তিনি সমান দক্ষ। বিশেষ করে ছোটদের জন্য যে সরল অনাড়ম্বর গদ্যে—স্বনামে ও ছদ্মনামে—জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি লিখে থাকেন, তার আবেদন সত্যিই অসামান্য।

বিজ্ঞানের বিষয়ে বাংলায় কিছু লিখতে হলে দুটো জিনিস জানা দরকার। বিজ্ঞান জানা দরকার, এবং বাংলাটাও জানা দরকার। শ্রীমতী সাধনা দুটোই অত্যন্ত ভাল জানেন। সত্যি বলতে কী, পৃথিবী ও আকাশের বিচিত্র সব রহস্যের কথা এমন সহজ ও সুন্দর বাংলায় এত প্রাঞ্জল করে এ-কালে আর-কেউ বুঝিয়ে বলতে পেরেছেন বলে তো আমার মনে হয় না। ছোটরা এ-বই পড়লে একদিকে যেমন তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও ভালবাসতে শিখবে, তেমনি অন্যদিকে সেই পরিবেশ সম্পর্কে আরও পরিচ্ছন্ন হবে তাদের ধারণা। মা-বাবারা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এ-বই তাঁদের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিতে পারেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও এ-বই অবশ্যই থাকা উচিত।

সূচীপত্র



বৈশাখ

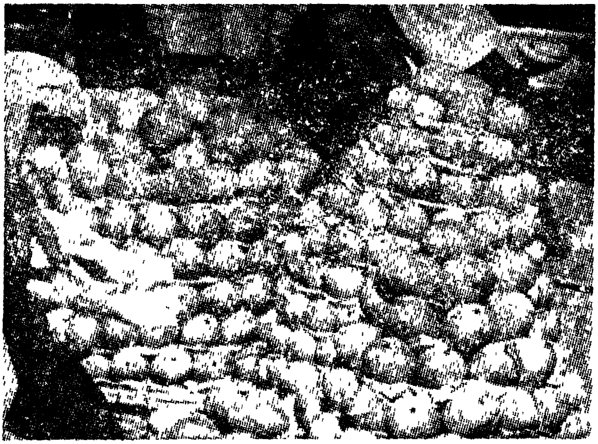
আস্তে আস্তে বেশ গরম পড়ে গেল তাই না? সাড়ে পাঁচটা বাজবার আগেই সূর্যদেব উঠে পড়েন। ছ'টার সময় তো রীতিমতো আলো। দিনটা অনেক বড় হয়ে গেছে। সন্ধেও নামে দেরিতে—সূর্যাস্ত হয় ৫টা বেজে ৫২ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে। রাত্তির বেলা পরিষ্কার

আকাশে অনেক তারা দেখা যায়। উত্তরে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ধ্রুবতারা আর সপ্তর্ষিমণ্ডল, পশ্চিম আকাশে ছায়াপথ আর কালপুরুষ, তারও নীচে লুব্ধক আর অগস্ত্য নক্ষত্র, মাঝখানে সিংহ রাশির পূর্বফাল্গুনী আর উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র, পূর্বদিক ঘেঁষে স্বাতী, কন্যা রাশি আর তুলা রাশি। তুলা রাশি হল বৈশাখ মাসের নতুন নক্ষত্রমণ্ডলী।

দিনের চড়া রোদে সব গাছপালাই এখন নতুন পাতার সাজ-পোশাক পরে ঝলমল ঝলমল করছে। বাঁদরলাঠি গাছে আঙুরের থোলোর মতো হলুদ ফুল ঝুলছে, ফুলে ফুলে হলদে হয়ে গেছে গুলমোহর। সবচেয়ে বেশি ফুল ধরেছে এখন কৃষ্ণচূড়া গাছে। শেষ হয়ে যাওয়া দোলের লাল আবির মেখে এখনও যেন একঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মুচকুন্দ চাঁপার গাছেও অদ্ভুত সুন্দর সুগন্ধ ভরা আঙুলের মতো লম্বা লম্বা ফুল ঝুলছে, আর আছে শিরীষ ফুলের চামর। বাড়ির ছোট ছোট টবে ফুটেছে বেল।

দুপুরের রোদ্দুরে হঠাৎ কখনও কখনও ভেসে আসে দস্যুর মতো কালো মেঘ। বিকেলের দিকে সূর্যকে ঢেকে ফেলে সে কী তুলকালাম কাণ্ড। প্রথমে শোঁ শোঁ করে ধুলোর ঝড় বইতে থাকে—তারপরই শুরু হয় কড় কড় কড়াত করে বাজ পড়ার শব্দ, মেঘের বুক চিরে ডাইনির জিভের মতো লক্‌ লক্‌ করে বিদ্যুৎ চমকায় আর তার সঙ্গে নামে তুমুল বৃষ্টি। অনেক সময় এই বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি কাসি জ্বরে ভুগতে হয়। স্কুলে খেলার ঘণ্টায় ছুটোছুটি করে খেলাধুলা করে এসেই তোমরা ক্লান্ত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেল—এতেও সর্দি-গর্মি হয়। এই সময় আইসক্রীম, কুলফি-বরফ, নানা রঙের শরবতের বোতল সাজানো চাকাওয়ালা গাড়ি দেখেও খেতে ভীষণ লোভ হয়। কিন্তু আইসক্রীম খেতে হলে নামকরা কোম্পানির

আইসক্রীম খাওয়াই ভাল। এই সময় কলেরার ইনজেকশান দেওয়ার অভিযানও শুরু হয়ে যায়। বাজারের কাটা ফল, মাছি বসা খাবার খাওয়াও ঠিক নয়। এই সময় নতুন ফলের মধ্যে আছে তরমুজ আর তোমাদের চিরপ্রিয় কাঁচা আম। কাঁচা আমের তেল-নুন-ঝাল-দেওয়া আচারের কথা ভাবতেও জিভে জল আসে। কিন্তু কাঁচা আমের পাতলা অম্বল খাওয়াই সবচেয়ে ভাল, আর খাওয়া ভাল বিকেলে আমপোড়ার শরবত। একটু কাঁচা পেঁয়াজ খেলেও গরম লাগবার সম্ভাবনা কমে যায়। নতুন শাক-সবজির মধ্যে আছে পটল, এঁচোড়, ঝিঙে, উচ্ছে আর নটে শাক। সময়ের সব শাক-সবজিই একটু-আধটু খাওয়া ভাল। বিশেষত তেতো খেলে এই গরমে ফোড়া ঘামাচি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।



জ্যৈষ্ঠ

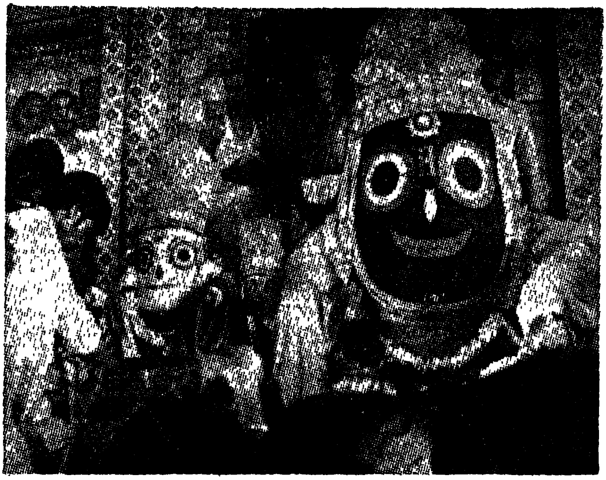
গরমের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে। এই গরমে প্রাণটা কেমন যেন আনচান আনচান করে, পড়তে বসতেও ইচ্ছে করে না, সব কিছুতেই একটা ঢিলেমির ভাব। কিন্তু ছুটির কাজগুলো পরে করার জন্যে ফেলে না রেখে আগে-আগে করে রাখাই ভাল। তা ছাড়া রোজ সকাল-সন্ধে একটু নিয়ম করে পড়তে বসতেও হবে, কারণ অনেকের তো স্কুল খুললেই আবার অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা। দুপুর বেলাটা থাক খেলবার জন্যে। অবশ্য রোদ্দুরে ছুটোছুটি করে নয়, ঘরে বসে লুডো, সাপলুডো, ক্যারাম, মেমারি, চাইনিজ চেকার, ওয়ারড মেকিং, একটু-আধটু দাবাও চলতে পারে।

দিনটা কী ভীষণ রকমের বড় হয়ে গেছে, বেলা যেন আর ফুরোতেই চায় না। সূর্যোদয় হয় ভোর চারটা বেজে উনষাট মিনিট

দশ সেকেণ্ডে, আর সূর্যাস্ত হয় ছটা বেজে ছ' মিনিট ছ' সেকেণ্ডে। রাত্তিরে আকাশের উত্তর-পূর্ব দিকে দেখতে পাওয়া যায় একটি নতুন তারা, যার নাম অভিজিৎ। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তুলা রাশির সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় বৃশ্চিক রাশিকে। বৃশ্চিক রাশি এ মাসের নতুন নক্ষত্রমণ্ডলী। তার মাঝখানে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। পশ্চিম আকাশ থেকে এ-মাসে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে কালপুরুষ আর বৃষ রাশি—বাকি সব তারা বৈশাখ মাসের মতোই।

তোমরা যারা গ্রামে বা মফস্বল শহরে থাকো, তারা দেখছ গাছে গাছে কাঁঠালের কী সমারোহ। এখন বেশির ভাগ কাঁঠালেই পাক ধরেছে। খাজা কাঁঠালের কোয়া কচকচ করে চিবিয়ে খেতে মজা, আর গোলা কাঁঠালের কোয়াগুলোর রস বার করে চিঁড়ে আর ঘন দুধ দিয়ে ফলার করে খেতে কী চমৎকার। গাছের আমগুলোয় আস্তে-আস্তে পাক ধরছে। বাজারে উঠেছে লিচু, জামরুল, বড় বড় বেল। জ্যৈষ্ঠ তো ফলেরই মাস। জ্যৈষ্ঠের গরমে আমাদের কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ওই গরমই তো ফলকে পাকায়। বেগুনফুলি, হিমসাগর, গোলাপখাস, ল্যাংড়া, এইসব খেতে-খেতে কি আমরা সেই জন্যে জ্যৈষ্ঠের গরমকে কেউ কৃতজ্ঞতা জানাই?

প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠে কতটুকুই বা হেরফের—গাছের নতুন পাতাগুলোর বয়েস শুধু একটু বেড়েছে। চাঁপাগাছ ফুলে-ফুলে ভরভরন্ত, কাঠচাঁপা, কনকচাঁপা, কাঁঠালিচাঁপা, তাদের নাম আর গন্ধই বা কতরকমের। জাম গাছে মঞ্জরীর ফাঁকে-ফাঁকে ছোট ছোট ফলের গুটি ধরেছে। কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, বাঁদর-লাঠি ফুলেরা এখনও গ্রীষ্মের সঙ্গে সমান তালে লড়ে চলেছে। রাস্তার পীচ অবশ্য হার মেনেছে রোদ্দুরের কাছে, গলে-টলে একাকার।



আষাঢ়

আকাশের মুখটা যেমন মাঝে-মাঝে থম্‌থম্‌ করে উঠছে বৃষ্টিভরা কালো মেঘের ভারে, তেমনই তোমাদের অনেকেরই মুখ থম্‌থম্‌ করে উঠছে স্কুল খুলে যাওয়ার সময় হয়ে এল বলে। এর ওপর অনেকের আছে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার চাপ। তবে অনেকের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা হয়তো একটু উলটো, অনেকেই স্কুল খোলার প্রতীক্ষায় রয়েছে, স্কুল খোলা থাকলে কতই না মজা!

এদিকে আকাশের মেঘে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলে কী হবে—দিন এখনও বড়ই আছে। ২২শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন হবে আর রাতটা হবে সবচেয়ে ছোট। মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকে থাকলেও সূর্যদেব রোজ উঠে পড়েন ভোর ৪টে

বেজে ৫৪ মিনিট ১৩ সেকেণ্ডে আর অস্ত যান বিকেল ৬টা বেজে ১৯ মিনিট ১৭ সেকেণ্ডে। দীর্ঘদিন গরমের পর মেঘ বৃষ্টি আর তার সঙ্গে মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ভালই লাগে—ভালই লাগে নতুন বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজতে আর খিচুড়ি, গরম-গরম মাছ-ভাজা আর পাঁপড়-ভাজা খেতে। এখন আমড়ার অম্বলের কচি আমড়াগুলো মুখে দিয়ে চিবোতে না চিবোতেই মাখনের মতো গলে যায়। এই সময় অনেক রকমের শাকপাতা বাজারে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে হিঞ্চে, কলমি আর রাঙা নটের নাম করা যেতে পারে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো জামওয়ালার কাছ থেকে কুড়ি নয়ায় দশটা জাম কিনে নুন মাখিয়ে খেতেও মন্দ লাগে না। আর ভালো লাগে কামরাঙা আর বিলিতি আমড়া খেতে।

রাত্তিরে যদি আকাশে মেঘ না থাকে তাহলে আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে তারার অবস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আকাশের পুব দিক ঘেঁষে দেখা দিয়েছে ছায়াপথ। তার নীচের দিকে আছে ধনু রাশি। ধনু রাশির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে দুটি নক্ষত্র: উত্তর আষাঢ়া আর পূর্ব আষাঢ়া। পশ্চিম আকাশ থেকে ছায়াপথ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর মিথুন রাশির অর্ধেকটাও দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

গাছ-গাছালির ধুলোমাখা পাতাগুলো নতুন বৃষ্টির জলে স্নান করে ধুয়ে মুছে এখন একেবারে ফিটফাট। যেখানেই মাটির চিহ্ন আছে, সেখানেই সবুজের ছোঁয়া, এমন-কী ছাতের কোণে পড়ে থাকা মাটিতেও দু-একটা ঘাস গজিয়ে গেছে। বর্ষায় সবচেয়ে বেশি আনন্দ যেন কদম গাছের আর কামিনী গাছের। ডালে ডালে ফুল ফুটিয়েই তারা নিশ্চিন্ত নয়, পথে পথেও ছড়িয়ে রাখে বর্ষামঙ্গলের রেণুভরা আলপনা।



শ্রাবণ

একটানা বৃষ্টির মধ্যে-মধ্যে আসে দু-একটা রোদ্দুরে ঝলমল দিন। কিন্তু শীতের রোদ্দুরের মতো এ-রোদ্দুরে আরাম লাগে না। বায়ুতে আর্দ্রতা খুব বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরমে কষ্ট পেতে হয়। তোমাদের মধ্যে যাদের গায়ে ঘামাচি বেরিয়েছে তারা তো খুব বেশি করেই অসুবিধেয় পড়ে যাও। ঘামের সঙ্গে সঙ্গে ঘামাচির চিড়বিড়ানি বাড়তে থাকে আর বাড়তে থাকে অস্বস্তি। ভালো করে সাবান মেখে স্নান করার পর সারা গায়ে ট্যালকাম পাউডার লাগানো ছাড়া

স্বস্তি পাবার আর অন্য কোন উপায় নেই। চুলকোলে মুখ ছিঁড়ে গিয়ে সামান্য ঘামাচিই অনেক সময় ফোড়া হয়ে যায়—তাতে আরও অনেক বেশি জ্বালা-যন্ত্রণা।

কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ে রাস্তায় যখন জল জমে যায়, তখন মনের আনাচে-কানাচে রেনি ডে-র সম্ভাবনা উঁকি মারতে থাকে। রাস্তাঘাট জলে থৈ-থৈ করছে—অনেকেই ভিজে ভিজে স্কুলে এসেছে। ক্লাস না আরম্ভ হতেই ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠে। কী মজা, না? এই সব দিনে কাজের মধ্যে আছে কাগজের নৌকো তৈরি করে জলে ভাসানো আর ঝালমুড়ি আর হজমিওয়ালার কাছ থেকে হজমি আর বিলিতি আমড়া কিনে খাওয়া। যারা কবিতা বা ছড়া লিখতে পারো বা ছবি আঁকো, তারা এই সব দিনের অবসরে কয়েকটা ছড়াও লিখে ফ্যালো, বা মনের সুখে ছবি আঁকো। এই শ্রাবণ মাসেই আছে তোমাদের চিরপ্রিয় ঝুলন উৎসব। রথের মেলায় কেনা মাটির পুতুল এবং আরও অন্যান্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করা পুতুল দিয়ে তোমরা ঝুলন সাজাও—মাথা খাটিয়ে সাজানোর মধ্যে নানাভাবে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করো।

আকাশে তাকালেই প্রায় মাঝখানে দেখা যায় শ্রবণা নক্ষত্র। নতুন তারার মধ্যে পূর্ব আকাশে উঁকি মারে মকর রাশি। পশ্চিম আকাশ থেকে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় কর্কট রাশি ও মিথুন রাশি। ছায়াপথ আকাশের প্রায় মাঝামাঝি চলে আসে। সূর্যোদয় হয় সকাল ৫টা বেজে ৩ মিনিট ৪২ সেকেণ্ডে এবং অস্ত যায় সন্ধে ৬টা বেজে ২১ মিনিট ৭ সেকেণ্ডে। এখনও উত্তর গোলার্ধে রাতের চেয়ে দিন বড়।

যেদিকেই তাকানো যায়, ঘন সবুজ। বাগানে গোলাপি লাল

বেগুনি দোপাটি ফুলের সঙ্গে আছে নানা রঙের জিনিয়ার বাহার। নানা রঙের প্রজাপতির মতো কত বাহারি রঙ তাদের। সাদা সুগন্ধি ফুলেদের মধ্যে আছে রজনীগন্ধা, যোজনগন্ধা, জুঁই আর ঈষৎ হলদেটে বকুল। টগরের রঙও সাদা কিন্তু গন্ধ ফিকে। কদম আর কামিনী সেই যে আষাঢ় মাস থেকে ফুটতে আরম্ভ করেছে, সারা বর্ষা তাদের আর বিরাম নেই। ফুটছে তো ফুটছেই।



ভাদ্র

নদীর দুকূল ছাপিয়ে জল, পুকুর কানায়-কানায় উপচে পড়ছে। কচুরিপানার বাড়বাড়ন্ত, তাদের মাথার ওপর বেগুনি ফুলের নিশান, মাঠঘাট সবুজে সবুজ। মেঘবৃষ্টি যে একেবারে বিদায় নিয়েছে তা নয়, তবে মেঘ-রোদ্দুরের দাঁড়িপাল্লাটা এখন রোদ্দুরের দিকেই বেশি ঝুঁকছে। আকাশ-জোড়া মেঘের বদলে এখন দেখা যায় আকাশের খানিকটা নীল, আর অনেকটা অংশ জুড়ে ফুলকপির মতো দেখতে মেঘের স্তূপ। ওপর দিকটা ডাঁটার মতো লম্বা, নীচের দিকটা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ফুলের মতো। হঠাৎ-হঠাৎ তারা সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নিয়ে আসে—তারপর আবার খাঁ খাঁ রোদ্দুর। মেঘ-ভাঙা সেই রোদ্দুর বড় তীব্র। গরমের দাপট এখনও কমেনি। হাওয়ায় আর্দ্রতা এখনও বেশি। বৃষ্টি না পড়লে তাই ভ্যাপসা গরমে

হাঁসফাঁস করতে হয়।

সূর্যোদয়ের সময় হল ভোর পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিট ছাপান্ন সেকেণ্ড। সূর্যাস্ত হয় সন্ধে ছ'টা বেজে চার মিনিট চুয়াল্লিশ সেকেণ্ডে। নতুন তারার মধ্যে আছে পুব আকাশে—কুম্ভ রাশি ও শতভিষা নক্ষত্র, ছায়াপথ প্রায় আকাশের মাঝামাঝি চলে এসেছে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অনেকটা পশ্চিমে সরে গেছে, আর পশ্চিম আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সিংহ রাশি।

দুর্গাপুজোও এগিয়ে আসছে, তোমাদের সকলের মনেই এখন খুব আনন্দ। অনেকেই এখন থেকে বসে গেছ কী কী জামা-কাপড় চাই আর পূজা-সংখ্যা পত্রিকা চাই তার তালিকা তৈরি করতে। পুজোয় যে-ফুল না হলেই নয়, সেই শিউলিও ফুটতে আরম্ভ করেছে। শিউলি ফুলের গন্ধই যেন দুর্গাপুজোর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু দুর্গা-পুজোর আগেই ভাদ্র মাসের ৩১ তারিখে আছে তোমাদের আরেকটি উৎসবের দিন। সেদিন বিশ্বকর্মা পুজো। সেদিন রঙবেরঙের ঘুড়ি, লাটাই, মাঞ্জা নিয়ে সকলেই তোমরা মেতে ওঠো। কে কটা ঘুড়ি কাটতে পার, তারই যেন প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। শুধু তোমরা কেন, বয়স্করাও অনেকে এইদিন ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে মেতে ওঠেন। ঘুড়ির রঙের বাহারই বা কতরকমের—লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি। কোনটা বা দুরঙা, কোনটা ল্যাজওয়ালা। তোমাদের সঙ্গে থাকে ছেঁড়া ঘুড়ি মেরামত করার নানান সাজসরঞ্জাম। পাতলা কাগজ, আঠা, ময়দার লেই। মাঝে-মাঝেই রাস্তা থেকে চিৎকার ওঠে—ভো-কাট্টা! সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে না, শুধু দেখছে, তারা কাটা ঘুড়ি ধরতে লগি হাতে লাগায় ছুট, ছুট, ছুট। কিন্তু এই দৌড়নোটা যে বিপজ্জনক, সেটা মনে রেখো।



আশ্বিন

পুজোর দিন এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে পুজোর ছুটি। স্কুলের ছুটির পর বিকেলে অনেকেই মা বাবা আর ভাইবোনেদের সঙ্গে দোকানে যাচ্ছ নতুন জামা জুতো কিনতে। অনেকে দর্জির দোকানে মাপ দিচ্ছ—কী প্যাটার্নের শার্ট প্যাণ্ট বা ফ্রক হবে তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে অনেক সময় মতের মিলও হচ্ছে না। জামা কাপড় শাড়ির দোকানে ভিড় উপচে পড়ছে, ভিড়ের ধাক্কায় ফুটপাথে হাঁটাও মুশকিল। পরের দিন স্কুলে গিয়ে গল্পও করছ কী কী নতুন জামা-কাপড় হল তাই নিয়ে। অনেকে আবার পুজোর ছুটিতে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবে—তারই আনন্দে মশগুল। এদিকে ঝলমলে পূজা-সংখ্যাগুলোও এখন একে একে বাজারে বার হতে থাকবে।

তোমরা নিশ্চয় ভাবছ, তোমাদের মনের মতো পুজো-সংখ্যা কবে বার হবে ? তাই না ? মোট কথা, সকলের মনেই এখন আনন্দ, মুখে একটা খুশি-খুশি ভাব।

এই খুশি শুধু তো মনের মধ্যেই আটকে নেই—যেন ছড়িয়ে পড়েছে সারা প্রকৃতিতে। চারিদিক সবুজে সবুজ। যাদের বাড়িতে বাগানে শিউলি গাছ আছে, তারা সকাল হলেই শিউলি ফুল কুড়োতে যাও। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর যেন সাদা আলপনা আঁকা থাকে। কী সুন্দর মিষ্টি গন্ধ। অন্যান্য ফুলেদের মধ্যে আছে দোপাটি, জিনিয়া, টগর, জবা আর অপরাজিতা। রাত্তিরে হাসনুহানা ফুলের গন্ধ সারা বাগান মাতিয়ে রাখে। বর্ষার বৃষ্টিতে ধোওয়া আকাশ কী গভীর নীল। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুকরো। রোদ্দুরের রঙ কাঁচা সোনার মতো হলুদ। গরমের দাপট কমে গেছে।

রাত্তিরে নির্মেঘ আকাশে তারারা ঝকমক করে। আকাশের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ছায়াপথ। উত্তর-পশ্চিম আকাশে সপ্তর্ষিও ক্রতু ও পুলহ নক্ষত্র আর দেখা যায় না—তেমনই পশ্চিম আকাশ থেকে প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে কন্যা রাশি। নতুন তারাদের মধ্যে পূর্ব আকাশে দেখা দিয়েছে মীন রাশি আর মেষ রাশি। মেষ রাশির অশ্বিনী নক্ষত্রের নাম অনুযায়ী এই মাসের নাম হয়েছে আশ্বিন।

আশ্বিন মাসে এই যে দুর্গাপুজো হয়, এর আরেকটা নাম অকালবোধন। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করবার জন্যে এই সময়ে দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। রাবণকে বধ করতে পেরেছিলেন বলেই এই মাসের দশমী তিথিকে বিজয়া দশমী বলা হয়। এই দিন অবাঙালিরা বিরাট বড় কাগজের রাবণ তৈরি করে তার মধ্যে নানা রকম আতস-বাজি ভরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। মূর্তিটি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে

বাজিগুলোও ফাটতে থাকে দুমদাম করে। পুজোর কদিন প্যাণ্ডেলে-প্যাণ্ডেলে ঘুরে প্রতিমা দেখার ধুম পড়ে যায়। কত নতুন ধরনের মূর্তি, কত আলো, কত লোক—মনে হয় যেন একটা বিরাট মেলা বসে গেছে। বিজয়ার প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন সকলেরই মন খারাপ হয়ে যায়। তারপর আছে বড়দের প্রণাম করা আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিষ্টিমুখ করা।



কার্তিক

সবে দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে, নতুন জামা কাপড়গুলোর নতুন-নতুন গন্ধ এখনও যায়নি, পুরোনো হয়ে মলাট ছিঁড়ে যায়নি রঙিন পূজা-সংখ্যা পত্রিকাগুলোরও। এদিকে স্কুল খোলারও তো সময় হয়ে এল, সামনেই বার্ষিক পরীক্ষার চোখ রাঙানি। পড়া তো বিশেষ কিছুই হয়নি পুজোর হৈ-হট্টগোলে—ভয়ে বুকটা দুরদুর করছে। তাই না? তবু সামনে আছে এখনও দুটি আনন্দের দিন—কালীপুজো আর ভাইফোঁটা। নানার রকম বাজি, পটকা আর আলোর মালাতে কালীপুজোর আনন্দও কিছু কম নয়। অনেক জায়গায় তুবড়ি প্রতিযোগিতা হয়, কার বানানো তুবড়ি কতটা উঁচুতে উঠে কতক্ষণ ফুলঝুরি ঝরায় তাই নিয়েই প্রতিযোগিতা। অনেকেই বাজারের কেনা

বাজিতে সন্তুষ্ট না হয়ে বাড়িতে মাটির খোলা কিনে তার মধ্যে নানা মশলা ভরে নিজেরাই তুবড়ি তৈরি করে নেয়। এই সব বাজির মধ্যে ফুলঝুরি আর রঙমশালই সবচেয়ে নিরাপদ।

বিপজ্জনক বাজি পোড়াতে গিয়ে অনেক সময়েই দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেইজন্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওই সব বাজি নিয়ে মাতামাতি না করাই ভাল। কালীপুজোর পরে আছে ভাইফোঁটা। বাঙালির ঘরে-ঘরে এটা একটা বড় সুন্দর উৎসব। ভাইয়ের কপালে বোন মঙ্গল টিপ পরিয়ে দেয়, তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। ভাই বয়েসে বড় হলে বোনকে আশীর্বাদ করে, আর ছোট হলে করে প্রণাম। ভাইবোন দুজনেরই মনে এইদিন খুব আনন্দ। এছাড়া আরও অনেকগুলো পুজো আছে এই মাসে—যেমন, জগদ্ধাত্রী পুজো, কার্তিক পুজো ও রাস। অনেক জায়গায় এই সব পুজো উপলক্ষেও ধূমধাম কিছু কম হয় না।

ক্রমশই দিনের চেয়ে এখন রাত্তির বড় হতে আরম্ভ করেছে। ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে সুতী চাদরটা টেনে নিতে হয়। আস্তে আস্তে শীত এগিয়ে আসছে, তবে শরৎ এখনও বিদায় নেয়নি। বিসর্জনের বাজনা বেজে গেলেও এখনও শিউলি, স্থলপদ্ম, জবা আর রেল লাইনের ধারে গ্রামের জলা মাঠে কাশ ফুলের সমারোহ। আকাশ এখনও উজ্জ্বল নীল, রোদ্দুর সোনালি। পুজোর শেষেও প্রকৃতি খুলে ফেলেনি তার উৎসবের সাজসজ্জা, শহরের একটু বাইরে গেলেই দেখা যাবে মাঠে-মাঠে সবুজ ধান উপচে পড়ছে।

রাত্তিরে আকাশে ঝলমল করে তারা আর ছায়াপথ, শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো যেন তরল সোনা। মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে আকাশও

যেন উদ্‌যাপন করছে তার দীপাবলী উৎসব। আকাশে এখন উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে গেছে ছায়াপথ। বৃশ্চিক রাশি প্রায় দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেছে, পূর্ব আকাশে দেখা দিয়েছে বৃষ রাশি। বৃষ রাশির কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম অনুসারেই এই মাসের নাম হয়েছে কার্তিক।



অগ্রহায়ণ

কার্তিক থেকেই হেমন্তের শুরু। এখন পুরো হেমন্তকাল। না-শীত না-গ্রীষ্মের দিন ফুরিয়ে এখন শীতের পাল্লাটাই যেন ভারী ভারী ঠেকে। ঋতু পরিবর্তনে আচমকা ঠাণ্ডা লেগে সর্দি কাসি গলাব্যথা হয়। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে, তাই আশে পাশে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে এখন মন নেই, এখন শুধু পড়া আর পড়া, আর তারই মধ্যে-মধ্যে কল্পনা করা, পরীক্ষার পর কী কী মজা করা যাবে, কত ঘুমোনো যাবে এই সব। এরই মধ্যে পড়তে পড়তে অজ্ঞানতেই কখন চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। কোথা থেকে সারা চোখে যেন রাজ্যের আলসেমি এসে জড়ো হয়। তবু দিন গড়াতে-গড়াতে স্কুলের পরীক্ষাও একদিন শেষ হয়। তখন চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আশ্চর্য

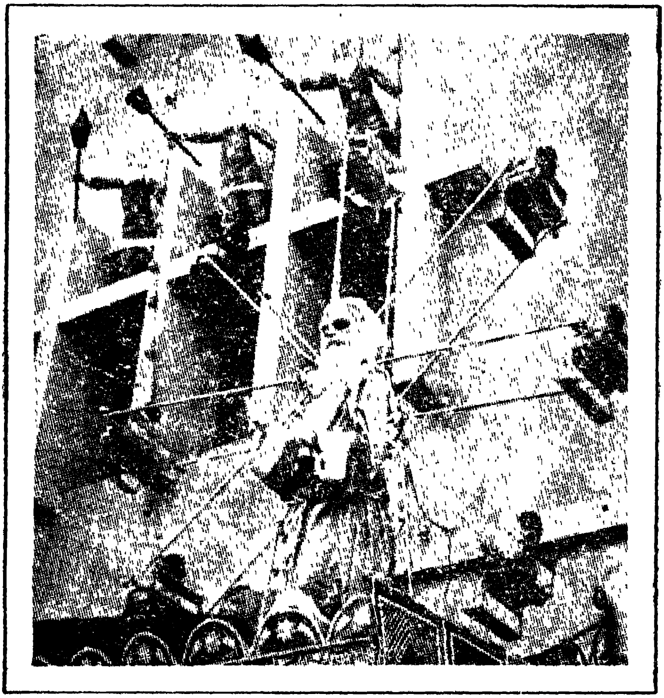
লাগে—প্রকৃতি কত বদলে গেছে। সন্ধে হতে-না-হতেই একটা ধোঁয়া-মেশা কুয়াশার চাদর যেন সারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে। আকাশের তারা যেন সেই চাদরের তলায় মুছে মুছে আসে। দিন এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে—বিকেল হতে-না-হতেই সন্ধে নেমে আসে।

অঘ্রান মাসে শহরে কোন পুজো-পার্বণ না-থাকলে কী হবে, গ্রামে এই সময় ধান পাকে, ধান কাটা হয়। ক্ষেতে-ক্ষেতে কৃষকদের মধ্যে কী দারুণ ব্যস্ততা। ব্যস্ততা গ্রামের ঘরে-ঘরে।

অঘ্রানে গাছের পাতা হলুদ হয়ে বুড়িয়ে যায়। কিছু-কিছু গাছের পাতা ঝরাও শুরু হয়ে যায়। যে-সব গাছে পাতা থাকে, তার উপরেও পড়ে যায় একটা ধুলোর পুরু আস্তর। মনে হয় অনেক দিন যেন ওরা স্নান করেনি। এখন ফুলের মধ্যে আছে কুন্দ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা বা ক্রিসানথিমাম আর কিছু কিছু রংবাহারি বিলিতি মরসুমি ফুল। অঘ্রান মাসে নতুন ঠাণ্ডা পড়বার সুখের সঙ্গে আরেকটা সুখও আছে—নতুন শাক-সবজি খেয়ে মুখের স্বাদ বদলানোর সুখ। একঘেয়ে কুমড়ো, পটল আর ঝিঙের ঝাঁকার বদলে এখন বাজারে নতুন ওঠা ফুলকপি, টোম্যাটো, গাজর, বীট, মটরশুঁটি, কচি বেগুন মুলো আর পালং শাকের ঝুড়িও দেখা যায়।

রাত্তিরে ধোঁয়াটে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ছায়াপথ এখন আকাশের প্রায় মাঝখান দিয়ে পূর্ব থেকে সোজাসুজি পশ্চিমে চলে গিয়েছে। পশ্চিম আকাশ থেকে ধনু রাশি ক্রমশই দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাচ্ছে, পূর্ব আকাশে রোহিণী আর আর্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে সবে দেখা দিয়েছে কালপুরুষ আর ছায়াপথের উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে উঁকি মারছে মিথুন রাশি। সব মিলিয়ে মনে হয়, অঘ্রান

এমনই একটা মাস, যার প্রথম পনরো দিনে আছে কেমন-যেন একটা আলসেমি আর দুঃখ-দুঃখ ভাব, আর শেষ পনরো দিনে আছে এমনই একটা শক্তি যা এনে দেয় পিকনিক, ক্রিকেট ম্যাচ বা নতুন কিছু করবার একটা দারুণ উৎসাহ।



পৌষ

কথায় বলে কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। এর থেকেই বোঝা যায় পৌষ মাসটা সকলের কাছে কত সুখের মাস, কত আনন্দের মাস। শীত এসে গেছে। যারা কলকাতায় থাকো তাদের কাছে শীতটা তেমন কিছু নয়, গায়ে একটা ফুল স্লীভ সোয়েটার চাপালেই হল। কিন্তু গ্রামের দিকে যেখানে এত বাড়িঘর নেই, খোলামেলা, সেখানে শীতের দাপট অনেক বেশি, আর পাহাড়ি অঞ্চলে তো কথাই নেই, শীত যেন সেখানে হায়নার হিংস্র কামড়—

শরীরের খোলা জায়গায় দাঁত বসিয়ে দেয়।

এই শীতের মধ্যেই আসে বড়দিন, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিসমাস, আসে ইংরেজি নতুন বছর। কলকাতায় যারা থাকো তাদের অনেকেই একদিন অন্তত নিউ মার্কেটে চক্কর লাগিয়ে আস। সেখানে লোকের ভিড় যেন উপচে পড়ে। বড়দিনের দিন তো হাঁটাই যায় না। তার আগেই একটা গোল জায়গা ঘিরে বিক্রি হয় নকল পাইন গাছ, যাকে বলা হয় ক্রিসমাস ট্রী, সাণ্টাক্লজ বা ক্রিসমাস বুড়ো, ঘর সাজাবার নানারকম জিনিস আর রঙিন কাগজের টুপি। চারিদিকে কার্ডে কার্ডে ছয়লাপ। কেকের দোকানের পাশ দিয়ে লোভ সম্বরণ করে হাঁটাই মুশকিল। ভিড় বাড়ে চিড়িয়াখানায় বকখালিতে আর ডায়মণ্ডহারবারে। পৌষ মাসেই বেশিরভাগ পিকনিক হয় বলে বাংলায় পিকনিকের আরেকটা নাম পৌষল্যা। পৌষ মাসের আরেকটা আকর্ষণ হল পৌষ সংক্রান্তির উৎসব, যাকে বলা হয় পৌষ পার্বণ। সেদিন কত পুলি-পিঠে-পায়েস, প্রত্যেকের বাড়িতেই কিছু না কিছু হয়। তাছাড়া পৌষ মাসে এমনিতেই খাওয়া-দাওয়া একটু ভাল হয়। বাজারে প্রচুর তরিতরকারি পাওয়া যায়, দামও অনেকটা কমে আসে। নলেন গুড়, পাটালি, জয়নগরের মোয়া, নতুন গুড়ের সন্দেশ আর মটরশুঁটির কচুরির মরসুম শুরু হয়ে যায়।

এই সময় বাগানে-বাগানে রঙের ছোঁয়া লাগে। হর্টিকালচার গার্ডেন, বিধানসভা কিংবা পাড়াগাঁর কুটির—সব জায়গাতেই রঙিন ফুলের সমারোহ। তার মধ্যে যেমন আছে দিশি ফুল গাঁদা, তেমনই আছে বড়-বড় রঙ-বেরঙের ডালিয়া, বাঘমুখো প্যানজি, সুইটপী ইত্যাদি বিদেশী ফুল। গোলাপের শ্রেষ্ঠ ঋতুও এই শীতকাল। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়।

আকাশ এই মাসে নির্মল নীল। দিনে ঝলমলে প্রাণ-জুড়োনো রোদ্দুরের তাপ বড় আরামদায়ক, রাত্তিরের আকাশে ঝকমকে তারার বাহার। ছায়াপথ এই সময়ে আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেছে। মকর রাশি পশ্চিম আকাশ থেকে প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে। পূর্ব আকাশে মিথুন রাশির পাশে নতুন একটি নক্ষত্র দেখা যায়, যার নাম 'প্রশ্বন্'। মনে হয় এই নক্ষত্রের নাম অনুসারেই এই মাসের নাম 'পৌষ' রাখা হয়েছে। 'পুষ্যা' নক্ষত্রের সঙ্গেও 'পৌষ' নামটির মিল আছে। ঐ নক্ষত্রটি কিন্তু আকাশে দেখা যায় মাঘ মাসে। দিন এখন যদিও রাত্তিরের চেয়ে অনেক ছোট তবুও ২৫ ডিসেম্বরকে বড়দিন বলা হয় এইজন্যে যে, ২১ ডিসেম্বরের পর মকরক্রান্তি পেরিয়ে সূর্যের আলো আবার উত্তর দিকে পড়তে থাকে। কাজেই রাত্তিরের আয়তন ক্রমশ কমে যায়। তবুও দিনের চেয়ে রাত্তির অনেক বড়ই থেকে যায় এই মাসে।



মাঘ

মাঘের শীতে বাঘ পালায়—কথাটা যদিও দারুণ চালু, তবু শহরে এই কথাটা ঠিক যেন খাটে না। যদিও হুহু করে উত্তর দিক থেকে শুকনো হাওয়া বইতে থাকে শুকনো পাতার রাশি নিয়ে, যে-হাওয়ায় ঠোঁট ফাটে, হাত পা আর গালের চামড়াও ফাটে, তবু কলকাতা শহরের চিড়িয়াখানার কোন বাঘকেই বিশেষ বিমর্ষ দেখায় না। বরং অনেক দর্শকের আনাগোনায় নিজেদের তারা কেউ-

কেটা ভেবেই খাঁচার মধ্যে বেশ ভারিক্কি চালে ঘোরাফেরা করতে থাকে। সাদা বাঘের জন্যে তো আছে আলাদা টিকিট, তার জন্যে আবার লম্বা কিউ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে আর মাঠে-ঘেরা গ্রামে-গঞ্জে অবশ্য ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়েই পড়ে।

ভোরের দিকে কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা থাকে। মাঠের ঘাস থাকে শিশিরে ভেজা। বেলা বাড়লেই কুয়াশার জাল কেটে দেখা দেয় রোদ্দুর। গাছগুলো ন্যাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শিমুল, কাঠ-বাদাম এবং আরও কয়েকটি গাছে তো একটিও পাতা অবশিষ্ট থাকে না। তারই মধ্যে পাড়ায়-পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে লাল শালু বা সাদা কাপড়ে লেখা বিজ্ঞাপনে সরস্বতী পুজোর কথা ঘোষিত হয়। সরস্বতী পুজো হয় প্রায় সর্বত্র—স্কুলে, কলেজে, পাঠাগারে, সিনেমা হলে—এমন-কী কোন-কোন অফিসেও। পাড়ায়-পাড়ায় তো পুজো আছেই। এখন সকলেই নতুন ক্লাসে উঠেছ, নতুন নতুন পড়ার বই কেনা হচ্ছে। স্কুলে পড়াশোনা হয়তো পুরোদমে শুরু হয়নি। তাই পুজোর চাঁদা তোলায় সকলের অদম্য উৎসাহ। অনেক স্কুলেই এই সময় নানান রকম প্রদর্শনী হয়। তাতে তোমাদের সারা-বছর-ধরে-করা হাতের কাজ, চার্ট ইত্যাদি সাজানো থাকে ; নিজেদের তৈরি জিনিস দর্শকদের দেখাতে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। অনেকেই স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ব্যাজ লাগিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করো। রঙিন কাগজের শেকল তৈরি করো, আলো দিয়ে সাজাও প্রতিমাকে।

সরস্বতী পুজোর সঙ্গে যে দুটো জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেগুলো হল কুল আর গাঁদাফুল। এ ছাড়াও আর যা যা চাই সেগুলো হল যবের শিষ, আমের মুকুল আর পলাশ কুঁড়ি। কুল খাওয়ার লোভ তো তোমরা সরস্বতী পুজো অবধি কোনো রকমে সম্বরণ

করে থাকো। কুলই বা কত রকমের—নারকোল কুল, টোপা কুল, দিশী কুল। আর গাছে নতুন আমের মুকুল দেখা দেয় এই সময়ে। মাঘের মাঝামাঝি এসে শীতের খেলা যেন ঝিমিয়ে পড়ে। দিন ক্রমশ বড় হয়, যদিও রাত্তিরের চেয়ে তা আয়তনে এখনও ছোট।

আকাশে ছায়াপথের অবস্থিতি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে সরাসরি উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে। কুম্ভ রাশি পশ্চিম আকাশে ক্রমশ দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যেতে থাকে, আর পূর্ব আকাশে দেখা দেয় কর্কট রাশি আর সিংহ রাশির খানিকটা অংশ। সিংহ রাশির 'মঘা' নক্ষত্রের নাম অনুসারেই এই মাসের নাম রাখা হয়েছে মাঘ।



ফাল্গুন

গাছে গাছে কচি নতুন পাতা মোড়ক খুলে বাইরের আলোয় ঝলমল করে ওঠে। অশথ গাছে, আম গাছে, এমন-কী নিম গাছেও নতুন পাতার রঙ লাল। ক্রমশ তা রোদ্দুরে পূর্ণতা পেয়ে সবুজ হয়ে ওঠে। শিমুল গাছেও দেখা দেয় কালো কালো ফুলের কুঁড়ি—কিছুদিন পরে সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসে রক্তের মতো লাল-লাল ফুল। নীল আকাশের পটভূমিতে সম্পূর্ণ পত্রহীন গাছে লাল-লাল ফুলের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। ফুল ফোটে পলাশ আর মাদার

গাছেও। পলাশ ফুলের রঙ মেটে সিঁদুরের মতো লাল। আম গাছের মুকুলে-মুকুলে মৌমাছির ভিড়; চারিদিকে মুকুলের মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। গাছের কোন ডাল থেকে ভেসে আসে কোকিলের ডাক। শহরের একটু বাইরে গেলেই এই সব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। শহরে তো গাছের সংখ্যা নানা কারণে ক্রমশই কমতির দিকে।

প্রকৃতির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে এ-মাসের উৎসবও রঙিন—দোল-পূর্ণিমা। নানা রকমের রঙিন প্লাসটিকের পিচকিরি কিনে নাও তোমরা—কেউ কেউ আবার পিতলের পিচকিরিও কেনো। সারা দিন বন্ধুদের সঙ্গে লাল নীল সবুজ হলদে রঙে মাতামাতি করবার পর সন্ধেবেলায় গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ নাও।

সূর্যের তেজের সঙ্গে সঙ্গে দিনের রুক্ষতাও বাড়তে থাকে। দিন-রাতের ব্যাপ্তি প্রায় সমান হয়ে আসে। গরম জামা, লেপ, কম্বল সব এক বছরের মতো বাক্সে বা অন্য কোথাও তুলে রাখা হয় ন্যাপথলিন দিয়ে। মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে যায়; অসুখ-বিসুখের পালাও শুরু হয়ে যায় ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এই সময়টা খুবই সাবধানে থাকবার সময়। এই সময়ে প্রত্যেকেরই উচিত বসন্তের টিকে নিয়ে নেওয়া। এই সময় তেতো খাওয়া খুব ভাল, বিশেষত নিমপাতার ঝোল বা নিম-বেগুন—কারণ তাতে অসুখ করবার সম্ভাবনা কমে যায়। খেলাধুলো করে এসে কিংবা স্কুল থেকে ফিরে এসে ভাল করে পরিষ্কার জলে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললে অসুখের আশঙ্কাটা কম থাকে।

অনেক দিন তো নানা উৎসব-পার্বণের মধ্যে দিয়ে কাটল, এবার লেখাপড়ায় মন দেওয়া উচিত, তা না হলে পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়ো করে পড়লে সব বিষয়েরই ভিত্তি কাঁচা থেকে যাবে। যারা মাধ্যমিক বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিচ্ছ, তাদের তো পরীক্ষা এসেই গেল। পড়ার

সময় অত্যধিক না বাড়িয়ে বা রাত জেগে না পড়ে—যতটুকু সময় পড়বে, খুব মন দিয়ে পড়লে ভাল ফল পাবে। অহেতুক ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই, তাতে মন দুর্বল হয়ে পড়বে। বরং মনকে বোঝাও এবং বিশ্বাস রাখো যে, দু বছর ধরে তো মন দিয়ে পড়েছি, অতএব পরীক্ষার ফল ভাল হবেই।

এ মাসে আকাশে ছায়াপথের অবস্থিতি গত মাসের মতোই দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে উত্তর-পশ্চিমে। উত্তর-পূর্ব আকাশে দেখা দেয় সপ্তর্ষিমণ্ডল। মীন রাশি পশ্চিম আকাশ থেকে ক্রমশই দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যেতে থাকে, সিংহ রাশিকে পূর্ব আকাশে পুরোপুরি দেখা যায়। এই রাশিরই উত্তর-ফাল্গুনী ও পূর্ব-ফাল্গুনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে এ-মাসের নাম রাখা হয়েছে ফাল্গুন।



চৈত্র

গ্রামে-গঞ্জে কাঁচা রাস্তায় ধুলো উড়তে থাকে, বাঁধানো রাস্তায় গলতে থাকে পিচ। গলা শুকিয়ে বারবার জলতেষ্টা পায়, মুখটা বিস্বাদ লাগে। গাজনের সন্ন্যাসী ত্রিশূল হাতে ভিক্ষা করে বেড়ায় —বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগি মহাদেব···। শিমুল গাছের ফুল ঝরে গিয়ে ফল ধরে, ফাটে, হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তার তুলো

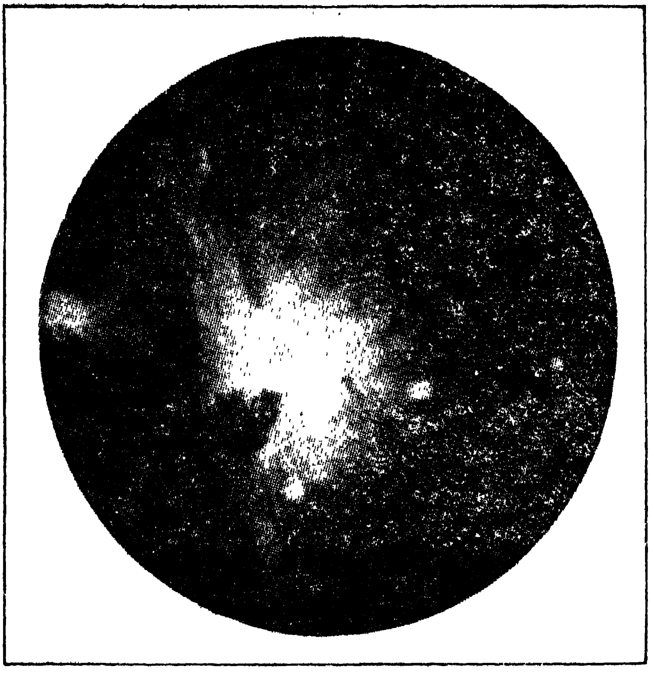
—বাঁদরলাঠি আর গুলমোর গাছে হলুদ ফুল ধরে, গরম বাড়তে থাকে, এমন মাসের নাম চৈত্র। সজনে গাছে ফুলের খেলা শেষ হয়ে গিয়ে ঝুলতে থাকে কচি-কচি ডাঁটা, আমের গাছেও নতুন গুটি ধরে। ফাল্গুনের নতুন পাতারা ধুলোয় ঢেকে মলিন হয়ে যায়। মুচকুন্দ, চাপা গাছে কুঁড়ি দেখা দেয়, বেল ফুল, লেবু ফুল, সব ফুলই সুগন্ধে ভরা।

একুশ মার্চে হয় মহাবিষুব। অর্থাৎ এই দিনে সূর্য ঠিক বিষুব-রেখার ওপর লম্বাভাবে কিরণ দেয়, কাজেই সারা পৃথিবীতে এই তারিখে রাত দিন ঠিক সমান সমান হয়, অর্থাৎ বারো ঘণ্টা রাত আর বারো ঘণ্টা দিন। তারপরেই দিন ক্রমশ বড় হতে থাকে, আর রাত হয় ছোট। সূর্যদেবের দেখা পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি, অস্তও যান দেরিতে। প্রচণ্ড রোদ্দুর উঠলে আর দিনের তাপ খুব বেড়ে গেলে বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, দু-এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে যায়। সন্ধেবেলার দিকে অবশ্য একটা গা-জুড়ানো ফুরফুরে হাওয়া বয় দক্ষিণ অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে।

বছর শেষ হয়ে আসে। চৈত্র সংক্রান্তিতে অনেক জায়গাতেই বসে চড়কের মেলা, নাগরদোলা আসে, আসে নানার ধরনের ম্যাজিক। সার্কাসের তাঁবু পড়ে, শুরু হয় বন্দুক ছুঁড়ে, বেলুন ফাটিয়ে বাজি জেতার খেলা। আসে সস্তা আইসক্রীম আর শরবতের রঙিন বোতল। এই মাসে অসুখ-বিসুখ যাতে না হয় সেইজন্যে সাবধানে থাকতে হয়। রোদ্দুরে ছুটোছুটি করাও এই সময়ে ভাল নয়, সর্দিগর্মি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। তাছাড়া গরম পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আসে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। সেইজন্যে খোলা ও মাছি-বসা খাবার খাওয়া বিপজ্জনক। এই মাসে তেতো খাওয়া ভাল। এই

মাসে কচি আমেরও দেখা পাওয়া যায় বাজারে। আমের পাতলা ঝোল খেলে মুখের রুচি বাড়ে, শরীরের পক্ষেও ভাল, আর ভাল লাগে কচি পটল আর সজনে ডাটা খেতে।

এ মাসে আকাশে ছায়াপথের অবস্থিতি দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিমে। সপ্তর্ষিমণ্ডল উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে অনেকটা নীচে নেমে আসে। আকাশের পূর্বে কোণে একটি নতুন নক্ষত্র দেখা দেয়, যায় নাম 'স্বাতী।' মীন রাশি পশ্চিম আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পূর্ব আকাশে দেখা দেয় কন্যা রাশি, তারই চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারেই এই মাসের নাম হয়েছে চৈত্র।



ঘুরন্ত নেবুলা

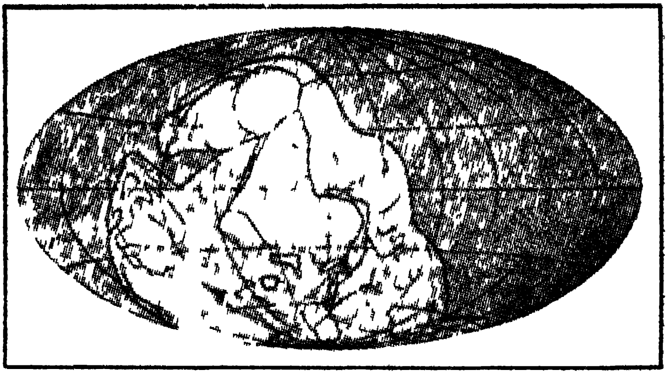
আগেকার দিনে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, তারা সকলেই তার চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু পরে বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সূর্যই মাঝখানে আছে আর অন্য সব গ্রহ তার চারপাশে অবিরাম ঘুরছে। এই সূর্য ও গ্রহদের সৃষ্টি হল কী ভাবে? পৃথিবী, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহরা কি চিরকাল এই ভাবেই আকাশে ছিল? তার উত্তরে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—না পৃথিবী সূর্য এবং গ্রহরা চিরদিনই এই

আকাশে ছিল না। কোটি কোটি বছর আগে এই আকাশে সূর্য, চাঁদ, পৃথিবী কাউকেই দেখা যেত না—তার বদলে দেখা যেত অনেকটা মেঘের মতো দেখতে এক রকম সাদা সাদা পদার্থ যাকে বলা হয় নেবুলা। লাতিন ভাষায় নেবুলা মানে মেঘ। আজও দূরবিনে বা দূরবিনের সাহায্য ছাড়াই খালি চোখে পরিষ্কার রাত্রির আকাশে এই রকম একটা মেঘ মেঘ অস্তিত্ব দেখা যায়—এগুলিকেও নেবুলা বলা হয়। গ্রহ নক্ষত্ররা জন্মের আগে ঠিক এই রকমই একটা মেঘ মেঘ অবস্থায় থাকে। এই রকম একটা নেবুলা থেকেই সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের জন্ম হয়েছে। এখন এই নেবুলা কী ভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে সূর্য ও গ্রহদের জন্ম দিল সেইটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার।

সূর্য, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহদের মধ্যে কয়েকটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। সবগুলোই প্রায় একই ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি, সবগুলোই একই সমতলে আছে এবং সব গ্রহগুলোই এক দিক থেকে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এই সব মিল দেখে আগে অনুমান করা হয়েছিল যে গ্রহগুলো সূর্যের শরীরের বিচ্ছিন্ন অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন সূর্যের চারপাশের গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। তারা একই নেবুলার বিভিন্ন অংশ—তাই তাদের ভেতরকার পদার্থগুলোও প্রায় একই রকমের। আকাশে যে সব নেবুলা আছে সেগুলো ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে কতগুলো এমন গ্রন্থি রয়েছে যেগুলো ভাসা ভাসা মেঘ মেঘ অবস্থা থেকে একটু বেশি ঘন হয়ে গেছে। এই রকম ভাবে ঘন হওয়ার মূলে আছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন নিউটন। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে, পৃথিবী সব বস্তুকে তার কেন্দ্রের

দিকে আকর্ষণ করে রেখেছে। সেই একই নিয়মে সূর্য পৃথিবীকে নিজের শক্তিতে আকর্ষণ করে রেখে তার চারপাশে ঘোরাচ্ছে। পৃথিবী ও তার আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট চাঁদকে নিজের আকর্ষণে বেঁধে রেখেছে। ঠিক এই ভাবেই যে নেবুলা থেকে সূর্য পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের জন্ম হয়েছিল তার গ্রন্থিগুলো আশে পাশের ছোট ছোট কণাদের আকর্ষণ করতে লাগল এবং সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে এই নেবুলা কখনোই এক জায়গায় স্থির হয়ে ছিল না—সব সময়েই ঘুরছিল। ঘুরন্ত অবস্থায় গ্রন্থিগুলো ক্রমশই ঘনীভূত হল। ঘুরতে ঘুরতে একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খেতে লাগল। এই ভাবেই ঘুরন্ত নেবুলা থেকে ক্রমশ সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের অর্থাৎ এক কথায় সমস্ত সৌর জগতের সৃষ্টি হল।



প্যানজিয়া

পৃথিবীতে ছটি মহাদেশ আছে—অ্যাণ্টার্কটিকাকে ধবলে সাতটি। কয়েকটি মহাদেশেব মধ্যে বেশ দূবত্ব আছে, কিন্তু এইসব মহাদেশের গাছপালা, জীবজন্তু ও শিলা অনেক জায়গাতেই একইবকম। এই মিল দেখে অনেক ভূ-বিজ্ঞানী মনে করেন যে, বহু কোটি বছর আগে এই মহাদেশগুলি পরস্পবের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

মহাদেশগুলির যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্ভব—একথা আগেকাব ভূ-বিজ্ঞানীরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা ভাবতেন, ভূভাগ সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে উঁচু হয়ে উঠে স্থলভাগের সৃষ্টি করতে পারে, কিম্বা কোন কারণে নীচে বসে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে যেতে পারে। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভূ-বিজ্ঞানী সিনডার প্রথম এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মহাদেশগুলি শুধু ডুবে যেতে বা উঁচু হয়ে উঠতেই পারে না—পাশের দিকেও সরে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর কথায় তখন কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এর অনেক বছর পরে ১৯০৮ সালে টেলার

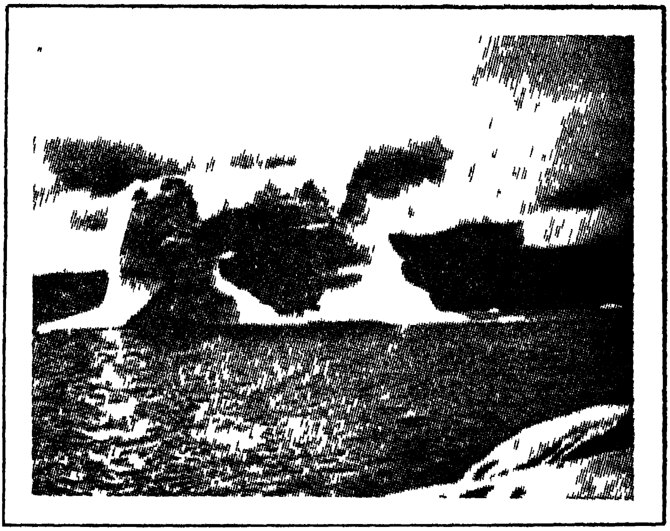
আমেরিকাতে ও ১৯১০ সালে ওয়েগনার জার্মানিতে এই অভিমত সমর্থন করলেন।

বিখ্যাত জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী ওয়েগনারেব মতে কয়েক কোটি বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীব সব স্থলভাগ যুক্ত হয়ে একটি মহাদেশের সৃষ্টি করেছিল। তিনি এই দেশটির নাম রেখেছিলেন 'প্যানজিয়া'। তাবপব প্রথমে সেটি খণ্ড খণ্ড হল এবং সর্বশেষে খণ্ডগুলি একে অন্যের থেকে দূবে সবে গেল। এই বিচ্ছেদ বর্তমান রূপ ধাবণ করল মাত্র দশ লক্ষ বছব আগে। ওয়েগনারেব মতে শুধুমাত্র মহাদেশগুলিই নয়—দক্ষিণ মেরুও স্থান পরিবর্তন কবেছে। কয়েক কোটি বছব আগে দক্ষিণ মেরু আফ্রিকার ঠিক নীচেই অবস্থিত ছিল। ওয়েগনারের মতে এই খণ্ড-গুলিব মধ্যে উত্তব ও দক্ষিণ আমেরিকাব গতি ছিল পশ্চিম দিকে আব দক্ষিণ দেশগুলির গতি দক্ষিণ দিকে। এই গতির জন্যে টুকরোগুলিব অগ্রভাগে কুঞ্চনের সৃষ্টি হয়েছিল।

ওয়েগনাব এই মতবাদেব পক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত তিনি বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলিকে—ছবিওয়ালা ছোট ছোট কাঠের টুকবো বাচ্চারা যেমন করে একটাব সঙ্গে আর একটা যোগ করে—ঠিক সেইরকমভাবে একটাকে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করে সাজাবাব চেষ্টা করেছেন। দেশগুলি এইভাবে যুক্ত করলে পর্বতমালার মধ্যে যে ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মাটির নীচে যে-সব জীবজন্তুব দেহ চাপে পড়ে পাথব হয়ে গেছে, অর্থাৎ যাকে ফসিল বা জীবাশ্ম বলা হয় সেইসব ফসিল বা জীবাশ্ম এবং শিলাতেও যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

এ সব থেকে এই কথাই অনুমান করা যায় যে, এই দেশগুলি তখন একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু হাজার হাজার মাইল

লম্বা সমুদ্রকে সংযুক্ত করবার মতো বিস্তৃত স্থলভাগ থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। সেইজন্যে অবিচ্ছিন্ন মহাদেশের কল্পনাই বেশি স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের ওড়িশা, উত্তর পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ, আফ্রিকার ট্রান্সভাল ও নাটাল, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া একই শ্রেণীর ও একই যুগের হিমবাহিত শিলা প্যানজিয়ার এই অবিচ্ছিন্নতার কথাই হয়ত প্রমাণিত করে।



বরফের আতঙ্ক

বরফ খেতে তোমরা সকলেই ভালবাস। বিশেষত গরমের দিনে আইসক্রীমের বাক্স, শরবত ওয়ালার রঙবেরঙের বোতল সাজানো ঠেলা গাড়ি, গলির মোড়ে কুলফি মালাই ওয়ালার হাঁক, গরমে আই ঢাই প্রাণটাকে যেন খানিকটা জুড়িয়ে দিয়ে যায়। এই সব খাবার বা পানীয়ের আসল কাজই হলো গরম জিভকে ঠাণ্ডা করা —এই ঠাণ্ডা করার মূলে আছে বরফ। এই বরফের আবার আতঙ্ক কী হতে পারে তোমরা সকলেই অবাক হয়ে ভাবছো। তোমাদের হয়তো হিমালয়ের তুষার রাজ্যের সেই রহস্যময় তুষারমানব 'ইয়েতি'র কথা মনে পড়ছে। না, এখানে সেই রহস্যের কথা বলব না। বরফের মধ্যে যে ভবিষ্যত পৃথিবীর ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে আছে সেই কথাই

বলবো এখন।

তোমরা সকলেই জান দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন মিশে তৈরি হয় জল। এই জলই ঠাণ্ডায় জমিয়ে বরফ তৈরি করা হয়। কিন্তু সব বরফই তো কারখানায় তৈরি হয় না। হাজার হাজার ঘনফুট প্রাকৃতিক বরফ জমে আছে পাহাড়ের চূড়োয় এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে। ওপরের বরফ নীচের বরফের স্তরে বেশি চাপ দিতে থাকলে নীচের বরফ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। এই সচল বরফের নদীকেই বলা হয় হিমবাহ। এই হিমবাহগুলো যদি সচল না হতো তাহলে আজকের পৃথিবীর সমস্ত জল জমে থাকতো বরফ হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে। সমুদ্র হতো নুনের চাদরে ঢাকা সমতলভূমি। কর্কট ও মকরক্রান্তিতে ধূ ধূ করত বালি।

কখনও কখনও পৃথিবীতে এমন একটা যুগ আসে যখন পৃথিবীতে বরফ তৈরির পরিমাণ খুব বেড়ে যায়—একে বলা হয় হিমযুগ। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে দুটি হিমযুগ এসেছে—একটি এসেছিল কয়লা তৈরি হওয়ার যুগে অর্থাৎ অঙ্গার যুগে দু কোটি আশি লক্ষ বছর আগে আর অন্যটি এসেছে প্লিস্টোসিন অর্থাৎ আধুনিক যুগে অর্থাৎ মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে। এই হিমযুগে আশি লক্ষ বর্গ মাইল ভূখণ্ড বরফের তলায় চাপা পড়েছিল। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার অনেকটাই ছিল বরফে ঢাকা। ভূ-বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা করার পর এখন এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, দশ লক্ষ বছর আগে যে হিমযুগ এসেছিল তাতে বরফ চারবার এগিয়েছে আর চারবার পিছিয়েছে। পৃথিবীর মহাদেশগুলো থেকে শেষবার বরফ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে সরে গেছে মাত্র পঁচিশ হাজার বছর

আগে। বৈজ্ঞানিকেরা এই সব শেষ বরফের এগিয়ে যাওয়ার সময়টার নাম দিয়েছে উর্ম্।

হিমযুগের উৎপত্তির ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও করে উঠতে পারেননি। আবার যে বরফ এগিয়ে এসে পৃথিবীর মহাদেশ-গুলোকে ঢেকে ফেলবে না একথাও নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায় না। উর্মের পর মাত্র পঁচিশ হাজার বছর কেটেছে—হয়তো বরফগুলো এখন কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিচ্ছে উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন 'হিমযুগ' পৃথিবীতে খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। তবু ভবিষ্যতে পৃথিবীর ধ্বংসবীজ হিসেবে বরফেরও একটা ভূমিকা আছে। আইসক্রীমের কাঠি চুষতে চুষতে বরফকে যেন তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো না কখনও—কারণ হয় বরফ আবার উত্তর আর দক্ষিণ মেরু থেকে এগিয়ে এসে সমস্ত ভূখণ্ড গ্রাস করে ফেলবে আর তা না হলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলের পরিমাণ দারুণ বাড়িয়ে তুলবে— নিউইয়র্ক, লণ্ডন, কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি পৃথিবীর সব বড় বড় বন্দরই জলেব তলায় ডুবে যাবে। তাহলেই ভেবে দেখ এই সব বিপত্তির মূলে যখন বরফই কলকাঠি নাড়ছে তখন গরমের দিনে তোমাদের জিভে যতই জল আনুক বরফকেই পৃথিবীর ধ্বংসের আর মানুষের সবচেয়ে আতঙ্কের কারণ বলা কিছু ভুল হবে? তবে একটা ভরসা তোমাদের দেওয়া যেতে পারে—সেই ভয়ঙ্কব দিনটি আসতে অন্তত পঞ্চাশ হাজার বছর দেরি আছে।



ভূমিকম্প

পুরাণের গল্প অনুসারে নাগ বাসুকি তাঁর ফণার ওপর পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন—তিনি যখন মাথা নাড়ান তখন পৃথিবীও কাঁপতে থাকে। অর্থাৎ বাসুকি যখন নড়েন তখনই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। পুরাণের এই গল্পর সঙ্গে কিন্তু আজকের বৈজ্ঞানিকদের দারুণ মতের অমিল রয়েছে। ভূমিকম্প কেন হয় সে সম্বন্ধে তাঁরা অনেক কারণ খুঁজে বার করেছেন। একটা পুকুরের জলে যদি একটা ঢিল ছুঁড়ে ফেলা হয়

—তাহলে দেখা যাবে সেই ঢিল পড়ার জায়গা থেকে অনেক তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—ভূমিকম্পও অনেকটা সেই রকমই ব্যাপার। মাটির নীচের শিলাস্তরও যদি কোন কারণে হঠাৎ কেঁপে ওঠে তাহলে জলের ঢেউয়ের মতো সেই কম্পনও ছড়িয়ে পড়বে শিলাস্তরের চারিদিকে। শিলাস্তরের এই কম্পনকেই বলা হয় ভূমিকম্প। 'ধস' নামলেও অনেক সময় সেখানকার মাটি কেঁপে ওঠে। মাটির তলায় গ্যাস সঞ্চিত হলেও অনেক সময় তা মাটি ভেদ করে বেরোবার সময় ভূমিকম্প ঘটায়। পৃথিবীর ভিতরের উত্তপ্ত অংশ ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। উত্তপ্ত পদার্থের আয়তন বেশি হয়—ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যখন আয়তন কমে যায় তখনও অনেক সময় শিলাস্তরে ভূমিকম্প হয়। উঁচু পাহাড় বা দ্বীপের শিলাস্তরে অনেক জায়গায় বড় বড় ফাটল থাকে—তাকে বলা হয় 'চ্যুতি'। এই চ্যুতির রেখা ধরে যখন হঠাৎ কিছু শিলা নড়ে ওঠে বা অনেক সময় শক্ত শিলাস্তরে নতুন কোন ফাটলের সৃষ্টি হয় কিম্বা ছুটি চ্যুতির মাঝখানের শিলায় একটার সঙ্গে আরেকটার প্রবল ঘর্ষণ হয় তখনই ভূমিকম্প ঘটে। শিলাস্তরের নড়া চড়ার ফলে যে ভূমিকম্প হয় তাকে বলা হয় টেক্‌টনিক্‌ ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্পে শিলাস্তর যতক্ষণ না ভাঙছে ততক্ষণ একটা প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। তারপর শিলাস্তর ভেঙে গিয়ে চ্যুতি বা ফাটলের পথ ধরে ধাবিত হয়। ভূমিকম্প সাধারণত নানা কারণে হতে পারে। যেখানে এখনও পাহাড় গড়ার কাজ চলেছে সেইখানেই সাধারণত ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশি হয়। এছাড়াও যেখানে আগ্নেয়গিরি আছে সেখানেও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পের কম্পন সাধারণত মাত্র কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হয়। এই কম্পন খুব বেশি হলে এক মিনিট কিম্বা ছু মিনিট স্থায়ী হতে পারে। একটি ভূমিকম্পে সাধারণত মাটি তিনবার কাঁপে। প্রথমে হঠাৎ একটা

মৃদু কম্পন হয়--তার পরে দ্বিতীয়বার একটি জোরালো কম্পন হয়—এই কম্পনটাই ভূমিকম্পের প্রধান কম্পন। তারপর আবার তৃতীয়বার মৃদু কম্পন হয়ে ভূমিকম্পের রেশ মিলিয়ে যায়। মাটির নীচে যে বিন্দুতে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় ভূমিকম্পের কেন্দ্র। মাটির ঠিক ওপরে সেই বিন্দুকে বলা হয় উপকেন্দ্র। আবহাওয়া অফিসে এক রকম যন্ত্র থাকে যাতে কোথাও ভূমিকম্প ঘটলেই তা ধরা পড়ে। এই যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ্।

শতকরা ৬৮ ভাগ ভূমিকম্প প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে হয়ে থাকে, শতকরা ২১ ভাগ ভূমিকম্প ভূমধ্যসাগর থেকে এশিয়া মাইনর, হিমালয় হয়ে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি জায়গাতে হয় এবং বাকি শতকরা ১১ ভাগ ভূমিকম্প পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় হয়। পাহাড়ের ঢাল যেখানে খাড়া আর দ্বীপপুঞ্জ যেখানে সমুদ্র থেকে খাড়া ভাবে ওপরে উঠে গেছে সেইখানেই ভূমিকম্প বেশি হয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন জায়গাই নেই যা ভূমিকম্পের ভয় থেকে একেবারে মুক্ত। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীতে প্রায়ই একটা না একটা ভূমিকম্প হয়ে চলেছে। গড়ে প্রতি ১৫ দিনে একবার করে জোরালো ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে—কিন্তু সেগুলো আমরা টের পাই না কারণ সেগুলি ঘটছে স্থল ভাগ থেকে দূরে—সমুদ্রে।

ভূমিকম্পে বেশির ভাগ ক্ষয় ক্ষতি ও প্রাণহানি হয় শহর ও ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ার জন্যে। ভূমিকম্পের সময় যেখানে মাটি ফেটে যায় সেখান দিয়ে অনেক সময় মাটির নীচ থেকে প্রচণ্ড বেগে গরম জল ও বালি ফোয়ারার মতো বেগে বেরিয়ে আসে। জাপানে ভূমিকম্পের সময় সমুদ্রে একরকম প্রবল ঢেউ দেখা যায় তাকে বলা হয় সুনেমিস্। ১৭৫৫ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে যে ভূমিকম্প হয়েছিল

সেইটেই বোধহয় সাম্প্রতিককালের পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। প্রথমে পশ্চিম দিকের সমুদ্রের নীচের খানিকটা অংশ ভূমিকম্পের ফলে নিচু হয়ে বসে গেল—সমুদ্রের জল খানিকটা সরে গেল। তারপর সমুদ্রের জল ৪০ ফুট উঁচু এক একটা প্রচণ্ড ঢেউ হয়ে উপকূলে আছড়ে পড়ে সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিল। ৬ মিনিট সময়ের মধ্যে ৭০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটল। ১৮৯৭ সালে আসামে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার কম্পন এতোই তীব্র ছিল যে, এক মিনিটের মধ্যে মাটি ২০০ বারেরও বেশি কেঁপেছিল। ১৯২০ সালে চীনের কানসুতে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার ফলে ২,০০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯২৩ সালে জাপানে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার ফলে ২৫,০০০ মানুষ এবং ১৯২৭ সালে চীনে ভূমিকম্পে আবার ১,০০,০০০ মানুষ মারা যায়। ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষে বিহারের ভূমিকম্পের ফলে ৮০০ জন লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে বেলুচিস্তানের কোয়েটা শহরে প্রবল ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৯৫০ সালে আসামেও বেশ বড় রকমের ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৯৫০ সালে উত্তর আফ্রিকার আগাদির শহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল। এই সব ভূমিকম্পের ফলে রেল লাইন, রেলের ব্রিজ ঘরবাড়ি সব ভেঙে যায়।

ভূমিকম্পের ফলে শুধু যে শহরই ধ্বংস হয় তা নয়—পৃথিবীর অনেক জায়গা নিচু হয়ে বসে যায়, আবার অনেক জায়গা উঁচু হয়ে ওঠে, অনেক নদী গতিপথ বদলায়, অনেক পাহাড়ি এলাকা থেকে বরফ ভেঙে নীচে পড়ে পাহাড়তলির ঘরবাড়ি ধ্বংস করে—কখনও বা বরফের বড় বড় চাঁই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে বিপজ্জনক ভাবে ভাসতে থাকে।

তাহলেই বোঝ পৃথিবীর ওপর নাগ বাসুকির মাথা নাড়ার প্রভাব কতখানি।



আগ্নেয়গিরি

পৃথিবীতে অনেক রকমের পাহাড় দেখা যায়, আগ্নেয়গিরিও এক রকমের পাহাড়। এই পাহাড় অবশ্য অন্যান্য পাহাড়ের মতো মাটি পাথর জমে তৈরি নয়, এই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে লাভা জমে। পৃথিবীর ত্বকের কোন ফাটল দিয়ে পৃথিবীর ভেতর থেকে যে গরম গলিত পদার্থ বেরিয়ে আসে তাকেই বলা হয় লাভা, পৃথিবীর ভেতর যখন এই উত্তপ্ত গলিত পদার্থ জমা হয় তখন একে বলা হয় ম্যাগমা।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী আগে উত্তপ্ত ছিল, ক্রমশ পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু পৃথিবীর ভেতরটা এখনও খুব গরম। মাটির নীচে পঞ্চাশ ষাট ফুট নামলেই তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেন-হাইট বেড়ে যায়—তাহলেই ভেবে দেখ যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় চার হাজার মাইল নীচে নামলে কী অবস্থা হবে।

পৃথিবীর কেন্দ্রে তাপ স্ফুটনাঙ্কের চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু তা বলে পৃথিবীর নীচে সব কিছু গলিত অবস্থায় নেই। পৃথিবীর ওপরের স্তরের চাপ পৃথিবীর ভেতরের সব পদার্থকে স্থিতিস্থাপক রেখেছে। কিন্তু কোন কারণে ওপরের স্তরের এই চাপ কমে গেলে এবং মাটির দুর্বল অংশে ফাটল দেখা দিলে এবং গ্যাসের সৃষ্টি হলে, মাটির নীচের পদার্থ সেই ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ক্রমশ ফাটলের চারপাশে জমা হয়। ঠাণ্ডা হলে জমাট বেঁধে কঠিন লাভার সৃষ্টি করে। এই ভাবেই সৃষ্টি হয় আগ্নেয়গিরি। যে ছিদ্র দিয়ে লাভা বের হয় তাকে বলা হয় জ্বালামুখ। লাভা সঞ্চিত হয়ে এই পাহাড় তৈরি হয় বলে একে সঞ্চয়জাত পাহাড়ও বলে।

আগ্নেয়গিরি নানা ধরনের হয়। কোন কোন আগ্নেয়গিরি থেকে সব সময়েই লাভার স্রোত বেরিয়ে আসে। কোন কোন আগ্নেয়-গিরিতে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হয়। কোন কোন আগ্নেয়গিরি আবার একেবারেই মরে গেছে, দীর্ঘকাল সেগুলি থেকে আর আগুন বা লাভা বেরোয়নি। যেখানে ভঙ্গিল পাহাড় আছে, যেখানকার ভূত্বক দুর্বল, সেখানেই আগ্নেয়গিরি বেশি আছে, প্রশান্ত মহাসাগরের চারদিকে আছে আগ্নেয়গিরি, একে বলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরের অগ্নিবলয়। আইসল্যাণ্ডের মাউন্ট হেকলা, ইতালির ভিসুভিয়াস, জাপানের ফুজিয়ামা, মার্টিনিক দ্বীপের পেলি খুবই বিখ্যাত।

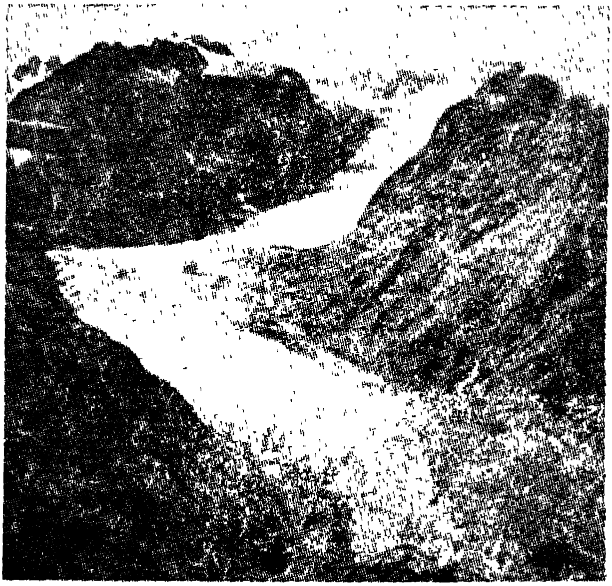


ক্যানিয়ন

নদী পৃথিবীর সব দেশেই আছে। কিন্তু নদীকে কেন্দ্র করে অনেক সময় অনেক বিস্ময়কর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এই রকমই প্রকৃতির একটি আশ্চর্যজনক সৃষ্টি হল উত্তর আমেরিকার কলরেডো নদীর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন। ক্যানিয়নকে বাংলায় গভীর খাত বলা যেতে পারে। সাধারণত পাহাড়ে গভীর নদীখাত দেখা যায়। পাহাড় খুব উঁচু আর ঢালু। ঢালু জায়গায় জলের স্রোত বেশি। পাহাড়ের মাটি শক্ত বলে নদী বেশি চওড়া খাত তৈরি করতে পারে না। কিন্তু স্রোত বেশি বলে নদী নীচের দিকে মাটি কেটে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। বৃষ্টিহীন বা প্রায় বৃষ্টিহীন মালভূমির মধ্যে দিয়ে নদী যখন বয়ে যায় তখন অনেক মাইল জুড়ে যে গভীর খাতের সৃষ্টি হয়, তাকে ইংরেজিতে বলে ক্যানিয়ন। মাইলের পর মাইল ধরে নদী বয়ে যায়

অনেক নিচু দিয়ে দু পাশে থাকে এবড়ো-খেবড়ো মালভূমি। উত্তর আমেরিকার বৃষ্টিহীন পশ্চিমের মালভূমিতে এ রকম অনেক ক্যানিয়ন আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটা রাজ্যের সান জুয়ান নদীতেও ক্যানিয়ন আছে। কিন্তু কলরেডো নদীর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন তুলনাহীন। এইরকম ক্যানিয়ন মরুপ্রায় অঞ্চলেই বেশি দেখা যায় কারণ বৃষ্টির জলে নদীর দুদিকের মাটি নরম হয়ে ধুয়ে যায় না। নদী শুকনো শক্ত মাটি সহজে ক্ষয় করতে পারে না, শুধু তলার দিকে কেটে কেটে গভীরতা বাড়াতে থাকে।

কলরেডো নদী আরিজোনা রাজ্যের উত্তর ভাগে একটি গভীর খাত কেটেছে, এই গভীর খাতটির নামই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন। এই রাজ্য বৃষ্টিহীন মরুভূমির মতো, সেই জন্যে দুই পাড়ে নদীর ক্ষয় খুব কম। নদীর তলার দিকেই ক্ষয় বেশি। এখানে অজস্র চুড়ো, ঢিবি ও ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি দেখা যায়। এই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন চার থেকে আঠারো মাইল চওড়া। সবচেয়ে বেশি গভীরতায় নদী পাড় থেকে এক মাইল পর্যন্ত নীচে নেমে গেছে। অ্যারিজোনার সীমানা থেকে নেভাডা পর্যন্ত প্রায় ২৮০ মাইল দীর্ঘ এই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের সবচেয়ে সুন্দর অংশে একটি গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক তৈরি করা হয়েছে। সাধারণত এই ক্যানিয়নের রঙ লাল কিন্তু এর প্রত্যেকটা শিলাস্তরেই বিশিষ্ট রঙ আছে, কোথাও হলদেটে, কোথাও ধূসর, কোথাও হালকা সবুজ এবং কোথাও বা গোলাপি। একেবারে নীচের রঙ চকোলেটের মতো, কোথাও কোথাও বেগুনি বা অন্যান্য রঙও দেখা যায়। প্রতিদিন কলরেডো নদী হাজার হাজার টন কাদা, বালি, নুড়ি ইত্যাদি বহন করে মালভূমির নীচের দিকে নদীখাতে বিপুল ক্ষয়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।



হিমবাহ

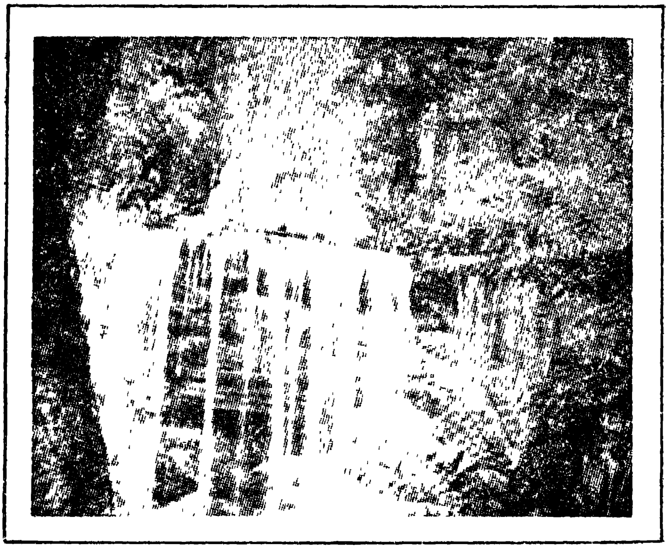
হিমবাহ প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি, কিন্তু অনেকেরই জানা নেই হিমবাহ কাকে বলে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মহাদেশেই উঁচু উঁচু পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের ওপর বছরের পর বছর বরফ জমতে থাকে। পাহাড়ের চুড়োয় এত ঠাণ্ডা যে, সেই বরফ গরমকালেও গলে যায় না। যে রেখার ওপরে গরমকালেও বরফ গলে যায় না, তাকে বলা হয় হিমরেখা, আর হিমরেখার ওপর যেখানে বরফ জমে, তাকে বলা হয় হিমক্ষেত্র। এই হিমক্ষেত্র থেকে ওপরের বরফের স্তরের চাপে আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নীচের বরফের স্তর পাহাড়ের

উপত্যকা বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। এই বরফের প্রবাহকেই বলা হয় হিমবাহ বা বরফের নদী। হিমবাহ যে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, সচল, একথা প্রথম আবিষ্কার করেন একজন সুইস্ ভূ-বিজ্ঞানী। তাঁর নাম লুই এগাসিস্। পৃথিবীর সবচেয়ে গতিশীল হিমবাহ হল গ্রীনল্যাণ্ডের হিমবাহগুলি। গরমকালে এগুলি এক-একদিনে ৬০ ফুট পর্যন্ত এগিয়ে যায় আবার পৃথিবীর বিশালতম হিমবাহ অ্যান্টার্কটিকার বিয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ার দিনে তিন ফুটেরও কম অগ্রসর হয়।

হিমবাহের সৃষ্টি যে শুধু পাহাড়েই তা নয়। যেখানে স্থায়ী হিমক্ষেত্র আছে যেমন অ্যান্টার্কটিকা, গ্রীনল্যাণ্ড, সেইখানেই হিমবাহের দেখা পাওয়া যায়। যে হিমবাহ সারা মহাদেশ জুড়ে থাকে তাকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে, যে হিমবাহ পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে নামে তাকে উপত্যকা হিমবাহ বলে। পৃথিবীতে এমন হিমযুগ অন্তত দুবার এসেছে, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মহাদেশই বরফের তলায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আজ থেকে পঁচিশ কিংবা তিরিশ হাজার বছর আগে এই ধরনের মহাদেশীয় হিমবাহ উত্তর আমেরিকার অর্ধাংশ ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ঢেকে রেখেছিল।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হিমবাহ যখন নীচের দিকে নামে, তখন তাকে এক বিশাল জিহ্বার মতো মনে হয়। জিহ্বাকৃতি হিমবাহ উপত্যকা বেয়ে গলতে-গলতে নীচের দিকে নামতে থাকে এবং অনেক সময় যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তার থেকে হাজার-হাজার ফুট নীচে নেমে ক্রমশ উত্তাপের ফলে গলে যায়। মেরুবৃত্তের বাইরে পামীরেই পৃথিবীর বৃহত্তম হিমবাহ আছে। এই বিশালকায় বরফের জিহ্বা বা নদী যখন পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে তখন

ভূ-প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন করতে থাকে। বরফ সব এবড়ো-খেবড়ো জায়গাকে শিরিষ কাগজের মতো ঘষে ফেলে মসৃণ করে দেয়, অনেক জায়গায় গর্তের মধ্যে হ্রদ সৃষ্টি করে। অনেক জায়গায় দেখা যায় ছোট ছোট হিমবাহ এসে বড় হিমবাহতে মিশেছে। যেখানে ছোট হিমবাহের জল অনেক উঁচু থেকে নীচের মুখ্য হিমবাহের উপত্যকায় এসে মিশেছে তাকে বলা হয় ঝুলন্ত উপত্যকা। হিমবাহের সৃষ্টি করা উপত্যকা খুব চওড়া হয়—দেখতে অনেকটা ইংরিজি 'U' অক্ষরের মতো। হিমবাহ তার জলের সঙ্গে বহন করা পাথর, নুড়ি, মাটি ইত্যাদির সঞ্চয় তার যাত্রাপথের দুপাশে, এবং যেখানে হিমবাহ সম্পূর্ণ গলে যায় সেইখানে জমা করে।



জলপ্রপাত

বড়-বড় জলপ্রপাতের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের প্রচণ্ড শব্দ শুনে এবং তাদের জলের তোড় দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। বেশির ভাগ জলপ্রপাতই নদী থেকে সৃষ্ট হয়েছে। নদীর গতিপথে কখনও-কখনও এমন কঠিন শিলা থাকে, যা নদীর স্রোত সহজে ক্ষয় করতে পারে না। কঠিন শিলার পরে যদি আবার কোমল শিলা থাকে তাহলে নদীর জলের তোড়ে কোমল শিলার ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু কঠিন শিলা ক্ষয় না পেয়েই উঁচুই থেকে যায়। এর ফলে নদীর গতিপথে উচ্চতা আর নিম্নতার সৃষ্টি হয়। কঠিন শিলার ওপর থেকে প্রবলবেগে জল নীচের ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার ওপর পড়ে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। নদীর গতিপথে কঠিন শিলা ও কোমল শিলা একটির ওপর একটিও

থাকতে পারে, কিংবা পাশাপাশি সাজানোও থাকতে পারে। দুটো ক্ষেত্রেই তাহলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হবে। নদী উচ্চভূমি থেকে হঠাৎ নিম্নভূমিতে পড়লেও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। জলপ্রপাত সাধারণত নদীর পার্বত্য ভাগেই বেশি দেখা যায়। আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল যে, সাধারণত দেখা যায়, জলপ্রপাত ক্রমশই নদীর উৎসের দিকে সরে যেতে থাকে এবং ক্রমে তা নদীর স্রোতের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কোনো-কোনো শিলা এত কঠিন যে, কিছুতেই ক্ষয় পেতে চায় না—যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার জাম্বেসি নদীর ভিকটোরিয়া জলপ্রপাতের নীচের শিলা। ভিকটোরিয়া জলপ্রপাতের তলদেশের শিলা ক্ষয় না পাওয়ায় জলপ্রপাতটি এক জায়গাতেই আছে।

জলপ্রপাত হিমবাহিত এলাকায়, মালভূমির প্রান্তদেশে নতুন গঠিত ভূভাগে বা অসমশিলায় গঠিত ভূভাগেই বেশি দেখা যায়। জলপ্রপাত আকারে বড় না হলে ছোট ঝরনার সৃষ্টি করে। কোথাও কোথাও মালভূমি অঞ্চলে ঘোড়ার খুরের মতো জলপ্রপাত দেখা যায়, কোথাও বা জলপ্রপাত সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নীচে নেমে যায়। ভারতে অনেক জলপ্রপাত আছে। এর মধ্যে কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত খুব বিখ্যাত। সরাবতী নদীর যোগ জলপ্রপাতের দৃশ্যও খুব সুন্দর, জব্বলপুরের মার্বেল রকসে নর্মদা নদীর জলপ্রপাতও বিখ্যাত।

উত্তর আমেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাতের নাম সকলেরই জানা আছে। উত্তর আমেরিকায় মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমানায় পাঁচটি হ্রদ রয়েছে। এই হ্রদগুলি একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছোট ছোট নদী দিয়ে। হ্রদগুলি এক সমতলে অবস্থিত নয়—এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্চতার তফাত দেখা যায় ইরি ও অন্টারিও

হ্রদের মধ্যে। এই দুটি হ্রদকে যুক্ত করেছে নায়েগ্রা নদী। ইরি হ্রদ থেকে বেরিয়ে নায়েগ্রা নদী ১৫৮ ফুট নীচে পড়ে একটা বিশাল জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। এই জলপ্রপাতই নায়েগ্রা জলপ্রপাত নামে বিখ্যাত। এই জলপ্রপাতের উত্তর অংশ কানাডায় এবং দক্ষিণ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে। গোট দ্বীপ এই জলপ্রপাতকে দুটি অংশে ভাগ করছে। এই জলপ্রপাতের জলের পতনের শব্দ ভীষণ গর্জনের মতো। অন্যান্য জলপ্রপাতের মতো এই নায়েগ্রা জলপ্রপাতও কানাডার অংশে প্রতি বছর তিন ফুট করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দিকে প্রতি বছর আট ইঞ্চি করে উৎসের দিকে সরে চলেছে।



কার্স্ট অঞ্চল

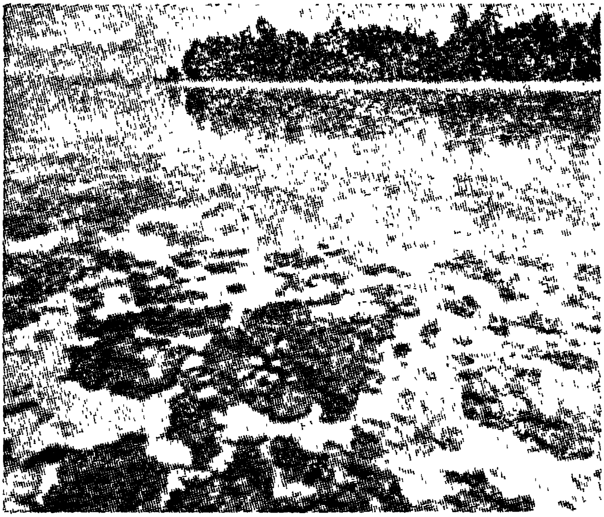
যেসব জায়গার শিলায় চুনের পরিমাণ বেশি থাকে, সেখানে এক বিশেষ ধরনের ভূ-প্রকৃতি গড়ে ওঠে, তাকে সাধারণত বলা হয় কার্স্ট অঞ্চল। ইউরোপে অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারে অবস্থিত যুগোস্লাভিয়ার এক স্থানে এইরকম ভূ-প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এই রকমের ভূ-প্রকৃতি পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যেমন—ফ্রান্সে, উত্তর আমেরিকার পূর্বে অবস্থিত আপলেশিয়ান পর্বতে, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে পেনাইন পার্বত্য অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার ব্লু পর্বতে, পশ্চিম হিমালয়ে, চেরাপুঞ্জির কাছে ও মধ্য প্রদেশের পাঁচমারিতে। এইসব অঞ্চলে চুনাপাথর বেশি আছে।

বৃষ্টির জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে এবং চুনাপাথরে গঠিত অঞ্চলে বৃষ্টি পড়লেই চুনাপাথর গলে যায়। এইভাবে সমস্ত অঞ্চলই ছিদ্রযুক্ত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও মাটির নীচে বড় বড় গুহার সৃষ্টি হয়। মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী অনেক সময় ছিদ্রপথে মাটির নীচে গিয়ে সুড়ঙ্গ-পথে প্রবাহিত হতে থাকে। ওপরে থাকে শুষ্ক খাত। কখনও ছিদ্রযুক্ত ভূস্তর ভিতরে ভিতরে এতই ফাঁপা হয়ে যায় যে, সমস্ত ভূস্তরই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যায়। মাটির নীচের গহ্বর ও সুড়ঙ্গ পথ অনেক সময় অনেক মাইল লম্বা হয়। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যামথ গুহার নিকটবর্তী অঞ্চলে অনেক গুহা ও সুড়ঙ্গ-পথ আছে, এগুলির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের জেনোলান ক্যাভারন পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

কিন্তু চুনাপাথর অঞ্চলের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি তুটির নাম হল স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট। চুন যখন বৃষ্টির জলে গলে যায়, তখন এক-এক ফোঁটা করে জল গুহার ছাদ চুঁইয়ে গুহার ভিতরের ছাদে এসে ঝুলতে থাকে। সেই ফোঁটাই মাটিতে পড়ে যায় এক সময়ে। এক সময়ে বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায় এবং ওপরে যেখানে জল চুঁইয়ে পড়েছিল আর নীচে যেখানে জল ঝরে পড়েছিল সেখানে সামান্য চুনের অংশ জমা হয়ে যায়। এইভাবে বছরের পর বছর ধরে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে চুনের ফোঁটা পড়ে পড়ে গুহার ভিতরের ছাদে ও নীচে চুন জমা হতে থাকে। নীচের চুন-জমা অংশটি হয় মোটা এবং খাটো, এগুলিকে বলা হয় স্ট্যালাগমাইট, ওপরের চুন-জমা অংশটি হয় সরু এবং লম্বা, একে বলা হয় স্ট্যালাকটাইট।

ক্রমশ চুন জমা হতে হতে ওপর ও নীচের অংশ জুড়ে একটি চুনের থামের সৃষ্টি হয়। কার্স্ট বা চুনাপাথরময় অঞ্চলের মাটির

নীচের গহ্বরে এমনই অজস্র স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট দেখতে পাওয়া যায়। এই রকম এক-একটি স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইটের থাম তৈরি করতে অবশ্য প্রকৃতির হাজার হাজার বছর সময় লেগে যায়। কোনো কোনো অঞ্চলের স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগমাইট হাজার বছরে এক ইঞ্চিরও কম বৃদ্ধি পায়। গুহার ভিতর এইসব অদ্ভুত থাম আর সুড়ঙ্গের মধ্যে নদী থাকলে কী হবে, চুনাপাথরময় অঞ্চলের বাইরেটা রুক্ষ ও শুষ্ক প্রকৃতির। চুনাপাথরে শ্রীহীন ছোট-ছোট ঘাস ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।



প্রবাল দ্বীপ

পৃথিবীর সব সমুদ্রেই দ্বীপ আছে, তবে এই দ্বীপগুলো একভাবে তৈরি হয়নি। কিছু-কিছু দ্বীপ সমুদ্রের ডুবো পাহাড়ের অংশ, কিছু-কিছু দ্বীপ মালভূমির উচ্চতম অংশ, কিছু-কিছু দ্বীপ আবার সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে যে লাভা বেরিয়ে এসেছিল তাই দিয়ে তৈরি। এছাড়া, মহাদেশের কাছাকাছি দ্বীপগুলো আসলে মহাদেশেরই বিস্তীর্ণ অংশ, যার মধ্যভাগ কোনো কারণে বসে গিয়ে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এছাড়াও সমুদ্রের যে অংশ কর্কটক্রান্তি আর মকরক্রান্তি বলয়ের মধ্যে রয়েছে সেখানে মহাদেশ থেকে বহু দূরে বা মহাদেশের

কাছাকাছি আর এক রকমের দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায় যাকে বলা হয় প্রবাল দ্বীপ। এই দ্বীপ প্রবাল কীট ও তার দেহ নিঃসৃত পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রবাল দ্বীপ অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গায় দেখা যায় না।

প্রবাল কীটের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্যে কয়েকটি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন। প্রথমত সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা ৬৮° ফারেনহাইটের কাছাকাছি হওয়া চাই। এই তাপমাত্রা বিষুবরেখার উত্তরে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ এবং বিষুবরেখার দক্ষিণে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই কর্কটক্রান্তি বা মকরক্রান্তি থেকে বেশি দূরে প্রবাল দ্বীপ দেখা যায় না। বেশির ভাগ প্রবাল দ্বীপই মহাদেশের পূর্বদিকে দেখা যায়, কারণ, ক্রান্তি বলয়ের মধ্যে অবস্থিত মহাদেশগুলিতে পূর্বদিক দিয়েই উষ্ণ সমুদ্র স্রোত বয়ে গেছে।

প্রবাল কীট আবার ১৫০ ফুটের চেয়ে গভীর জলে বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ, জলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাপমাত্রা কমতে থাকে আর কমতে থাকে সূর্যের আলো। সেই জন্য প্রবাল কীট জন্মের জন্য অগভীর অথচ উষ্ণ সমুদ্রের প্রয়োজন। এ ছাড়াও যেখানে কোনো নদীর জল সমুদ্রে এসে পড়ে সেখানেও প্রবাল কীট বাঁচতে পারে না। কারণ, টাটকা জলে প্রবাল কীটের জন্মের উপযোগী লবণ থাকে না। ঘোলা জলও প্রবাল কীটের জন্মের পক্ষে অনুকূল নয়।

উষ্ণ সমুদ্রের পরিষ্কার অগভীর জলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবাল কীট জন্মায়। এই প্রবাল কীটের শরীর থেকে চুনের মতো এক রকম শক্ত বস্তু বের হতে থাকে, যেগুলো প্রবালের দেহ সংলগ্ন থাকে এবং বিভিন্ন ধারায় বৃদ্ধি পেতে পেতে ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্রের ঢেউ এই চুন জাতীয় পদার্থকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে এবং এই গুঁড়ো

সমুদ্রের তলায় জমা হয়। এইভাবে প্রবাল কীটের জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে ও চুন জাতীয় পদার্থ ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে উঠতে জলের উপরিভাগে স্থলের সৃষ্টি করে। ক্রমশ সমুদ্রের ওপরে জেগে-ওঠা চুনের স্তর মাটিতে পরিণত হয়।

পাখিরা সেখানে বীজ এনে ফেলে, গাছপালা জন্মায়, এইভাবে প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এই প্রবাল দ্বীপ তৈরি হতে কিন্তু অনেক সময় লাগে। এক ফুট উঁচু হতে প্রবাল দ্বীপের অন্তত দশ বছর সময় লেগে যায়। কোনো প্রবাল দ্বীপ স্থলভাগের একেবারে পাশে তৈরি হয়, কোনো-কোনো প্রবাল দ্বীপ মহাদেশ থেকে একটু দূরে উপকূলের প্রায় সমান্তরাল রেখায় তৈরি হয়। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের বেরিয়ার রীফ। আবার, কোনো প্রবাল দ্বীপের চারদিকে থাকে স্থলভাগ এবং মাঝখানে জলাভূমি বা হ্রদ। এগুলোকে বলে ‘অ্যাটল’।



উষ্ণ প্রস্রবণ ও গীজার

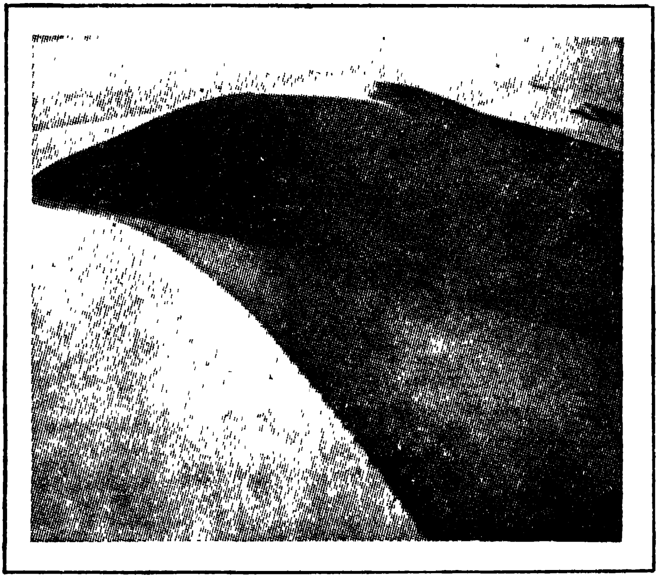
যে-সব জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত হয়, সাধারণত সেই সব জায়গাতেই উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়। মাটির ভিতরের জল অনেক নীচে নেমে গিয়ে যদি গরম অবস্থার চাপের ফলে তাড়াতাড়ি মাটির ওপরে উঠে আসে তা হলেই উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব উষ্ণ প্রস্রবণে এমন অনেক খনিজ পদার্থ মেশানো থাকে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ভারতে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। যেমন বীরভূমের বক্রেশ্বরে, বিহারের রাজগীরে এবং মুঙ্গের জেলার সীতাকুণ্ডে। এ-ছাড়াও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেও অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বদ্রীনাথের মন্দিরের কাছে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, মানালির বশিষ্ঠ প্রস্রবণও বিখ্যাত। এই সব উষ্ণ প্রস্রবণে মাটির তলা থেকে গরম জলের ধারা নিজে থেকেই

অনবরত বেরিয়ে আসছে—বুদ-বুদ করে বুড়বুড়ি কেটে—জল নীচে থেকে ওপরে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হয় না।

আইসল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন পার্কে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। আলাস্কা, তিব্বত, জাপান, মালয় উপদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকাতেও গীজার আছে। ভূত্বকের অনেক অংশ পাহাড় তৈরি বা অন্যান্য অনেক কারণে নীচে বহু দূর পর্যন্ত ফেটে যায়—সেই ফাটলের নীচে মাটির তলার জল এসে পৌঁছলে ভীষণ গরম হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়ে মাটির স্তরের ওপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করে এবং গরম জল এক স্তম্ভের আকারে উৎক্ষিপ্ত করে বাইরে বেরিয়ে আসে। কতক্ষণ পরে পরে জল বাইরে বেরিয়ে আসবে তার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে—সেই সময়ের ব্যবধানে জল বাইরে আসে। এই জলস্তম্ভ কয়েক ইঞ্চি থেকে আরম্ভ করে কয়েক শো ফুট উঁচু হতে পারে। আইসল্যাণ্ডের হেকলা আগ্নেয়গিরির গ্রেট গীজারের নাম অনুসারে এই ধরনের ফোয়ারার মতো উষ্ণ প্রস্রবণগুলির নাম রাখা হয়েছে গীজার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকি পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে ওয়াওমিং, মণ্টানা এবং ইডাহো রাজ্য এসে মিলিত হয়েছে সেখানে রয়েছে বিখ্যাত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক। এখানে যত গীজার আছে পৃথিবীর আর কোথাও তত গীজার নেই। এখানকার ওল্ড ফেথফুল গীজার খুবই বিখ্যাত। আইসল্যাণ্ড দ্বীপে তিরিশটি সক্রিয় গীজার আছে, ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে আছে দুশোটি। সাধারণ উষ্ণ প্রস্রবণে জলধারা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় না, কিন্তু গীজারের জলধারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জল ও বাষ্প সহকারে প্রবল বেগে বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই হল উষ্ণ প্রস্রবণ ও গীজারের মধ্যে পার্থক্য।

সোডার বোতল খুললে যেমন সবেগে সোডা বেরিয়ে আসে গীজারের জলও অনেকটা সেইরকমভাবেই বাইরে বেরিয়ে আসে। সাধারণত যে-সব জায়গায় পাহাড় ও আগ্নেয়গিরি বেশি আছে সেইখানেই এগুলি দেখা যায়।



মরুভূমি

পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে বছরে একবারও বৃষ্টি হয় না। সাধারণত উষ্ণ মণ্ডলে যেখানে বছরে দশ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টি হয় সেখানেই উষ্ণ মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও মরুভূমি দেখা যায়। যেমন, চীন ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী গোবি মরুভূমি। মরুভূমি বলতে যদি এমন সব জায়গা বোঝায় যেখানে কোনো গাছপালা জন্মায় না—তাহলে এশিয়ার সবচেয়ে উত্তরে সাইবেরিয়ার অংশ, কানাডার উত্তরাংশ এবং গ্রীনল্যাণ্ড ও দক্ষিণ মেরুদেশ বা অ্যান্টার্কটিকাকেও মরুভূমি বলা যেতে পারে। এই সব দেশে ভীষণ ঠাণ্ডা এবং সব কিছু বরফে ঢাকা থাকে, সেইজন্যে কোন

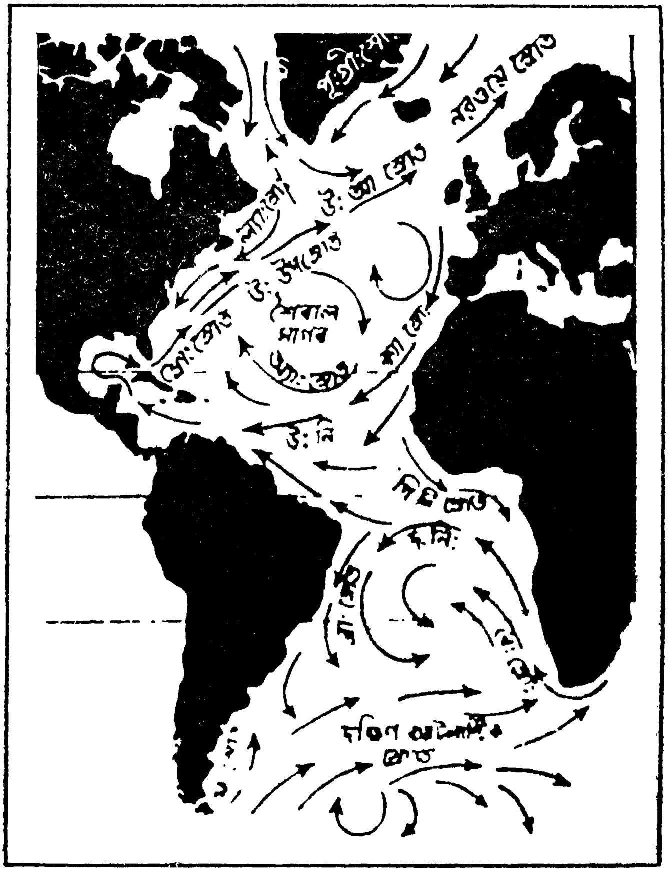
গাছপালা জন্মায় না।

পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি হল উত্তর আফ্রিকার সাহারা। উত্তর থেকে দক্ষিণে এর বিস্তার গড়ে ৬০০ মাইল, এবং পূর্ব-পশ্চিমে লোহিত সাগর থেকে প্রায় আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এর বিস্তার প্রায় ৩,০০০ মাইল। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাহারা মরুভূমি আয়তনে ইউরোপের চার ভাগের তিন ভাগের সমান। গোবি মরুভূমিও বিশাল। আরব দেশ ও ইরাকের অনেক অংশকেও মরুভূমি বলা যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কালাহারি মরুভূমি, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতেও বিশাল মরুভূমি আছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালি-ফোর্নিয়া ও অ্যারিজোনা রাজ্যেও মরুভূমি আছে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের পেরুতেও অ্যাটাকামা মরুভূমি আছে, আর ভারতে আছে থর মরুভূমি।

উষ্ণ মণ্ডলের মরুভূমিগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলির বেশির ভাগই মহাদেশের পশ্চিম দিকে ২০° থেকে ৩০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই মরুভূমি সৃষ্টির কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এখানে সাধারণত স্থলভাগ থেকে বায়ু জলভাগের দিকে যায়—সেইজন্যে বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে না, আর বৃষ্টিপাতও হয় না। এছাড়াও এই সব মরুভূমিগুলির পাশ দিয়ে শীতল সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়, কাজেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আরও কমে যায়। কিন্তু অনেক মরুভূমি গাছ-পালার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলেও প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে দামি দামি খনিজ সম্পদ দিয়ে এই ক্ষতি পুরণ করে দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে সোনা পাওয়া যায়। আরব ও ইরাকের মরু অঞ্চলে ও ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে পেট্রল পাওয়া যায়। চিলির অ্যাটাকামা মরুভূমিতে পাওয়া যায় তামা ও প্রচুর নাইট্রেট বা

সোরা। চিলির মতো এত শুকনো মরুভূমি বোধহয় আর কোথাও নেই—এমন জায়গাও আছে যেখানে কুড়ি বছরেও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি।

মরুভূমিতে গাছপালা বেশি না থাকায় বায়ু অবাধে ক্ষয়কার্য চালায়। দিনে সূর্যের তাপে মরুভূমির শিলা প্রসারিত হয়, আবার রাত্রে ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হয়। ওইভাবে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে শিলা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে বালির সৃষ্টি করে। বায়ু এই বালি উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বালুময় বায়ু যেখান দিয়ে বয়ে যায় সেখানেই ক্ষয়কার্য চলতে থাকে। মাটির স্তর থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে এই ক্ষয়পর্ব সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়াও উড়ন্ত বালি কোথাও কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অর্ধচন্দ্র আকৃতির বালিয়াড়ি সৃষ্টি করে। এই বালিয়াড়িগুলিকে বলা হয় বারখান।



সমুদ্রস্রোত

সমুদ্রের জল কখনও স্থির থাকে না। সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখা যায়, ঢেউয়ের পর ঢেউ তীরে এসে আছড়ে-আছড়ে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু শুধু ঢেউই নয়, সমুদ্রের জলে আরেক রকমের গতি আছে, তাকে বলা হয় সমুদ্রস্রোত। এই সমুদ্রস্রোত দু'রকমের

হয়—শীতল ও উষ্ণ। স্থলভাগের ওপর দিয়ে যেমন নদী বয়ে যায়, জলের ওপর দিয়ে এই স্রোতও তেমন একটি নির্দিষ্ট পথে বয়ে যায় বছরের পর বছর। এই স্রোতের উৎপত্তির অনেক কারণ আছে। সাধারণত, বায়ুপ্রবাহকেই এর উৎপত্তির কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এবং বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসারেই এই স্রোত প্রবাহিত হয়। এছাড়া আরও কারণ আছে—জলের উষ্ণতার তারতম্য, পৃথিবীর ঘূর্ণন। তাছাড়া মহাদেশগুলির আকৃতিও এই স্রোতের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণত তিনটি মহাসাগরেই স্রোতের আধিক্য দেখা যায়। আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের সমুদ্রস্রোতের গতিপথ আবার ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তিত হতে থাকে। শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর জন্যে একরকম আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জন্যে আরেক রকম। প্রত্যেকটি সমুদ্রেই বিষুবরেখার কাছে উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে দুটি করে স্রোত আছে। এগুলির সৃষ্টি হয়েছে আয়ন বায়ুর প্রবাহে। এদের মাঝখানে আবার একটি করে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত আছে। নিরক্ষরেখায় উৎপত্তি বলে এই স্রোতের জল সর্বদা গরম থাকে—সেইজন্যে একে উষ্ণ স্রোত বলা হয়। বিষুবরেখা থেকে যে স্রোতগুলি উত্তরে বা দক্ষিণে যায়, সেগুলির জল গরম। উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিক থেকে যেগুলি বিষুবরেখার দিকে আসে, সেগুলি ঠাণ্ডা অর্থাৎ শীতল স্রোত। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখান দিয়ে উষ্ণ স্রোত ও শীতল স্রোত পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছে বিপরীত গতিতে। এই সব জায়গায় ঝড়-ঝঞ্ঝা, কুয়াশা লেগেই থাকে। যেমন, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলের নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপ।

উষ্ণ স্রোতগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল, উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মেক্সিকো উপসাগরের উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত বা গালফ স্ট্রীম এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানের পূর্ব উপকূলের কুরো-শিয়ো স্রোত। এগুলি দেশের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে আবহাওয়াকে গরম রাখে, বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে। এমন-কী গালফ স্ট্রীম যখন পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বেঁকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে যায় তখন এখানকার সমুদ্রে জল জমতে পারে না। সারা বছরই বন্দরে জাহাজ চলাচল করতে পারে, অথচ প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থিত উত্তর আমেরিকার ল্যাবরাডর ঠাণ্ডার জন্যে মানুষের বাস করার প্রায় অনুপযুক্ত এবং শীতকালে ল্যাবরাডর স্রোতের প্রভাবে উত্তর-পূর্ব কানাডায় প্রচুর ঠাণ্ডা পড়ে।



অ্যাণ্টার্কটিকা

পৃথিবীর উত্তর মেরুবিন্দু ঘিরে আছে উত্তর মহাসাগর, কিন্তু দক্ষিণ মেরুবিন্দু একটি মহাদেশের ওপর অবস্থিত—এই মহাদেশের নাম অ্যাণ্টার্কটিকা। এই মহাদেশটির অন্যান্য মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও চারিদিক সমুদ্রে ঘেরা। এই মহাদেশের বেশির ভাগ জায়গাই পুরু বরফের চাদরে ঢাকা। অনেক জায়গায় এই বরফের স্তর আসল মাটি থেকে দু মাইল পর্যন্ত উঁচু। সেই জন্যে, বরফের স্তরের নীচে এই মহাদেশের ভূ-প্রকৃতি কেমন, তা শুধু অনেক জায়গায় অনুমান করে নেওয়া হয়েছে।

অনুমান করা হয়, পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ বরফ এই অ্যাণ্টার্কটিকাতেই জমা আছে। এই বরফ যদি গলে যায়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের জলের উচ্চতাও ভীষণভাবে বেড়ে যাবে এবং তার ফলে বেশির ভাগ শহরই জলের তলায় ডুবে যাবে। কিন্তু এখানে যে-সব

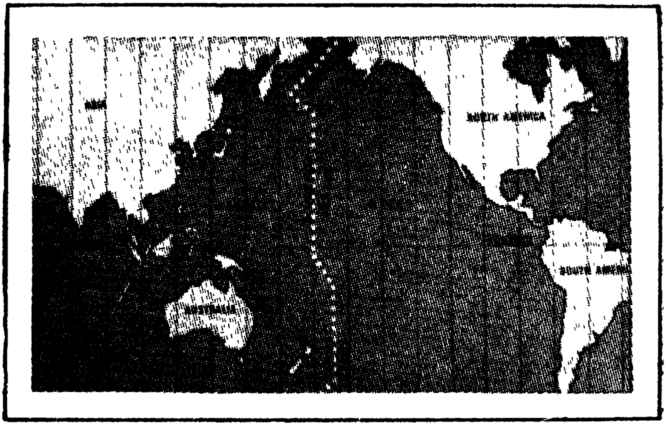
ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে, এই মহাদেশ চিরদিনই এই রকম বরফে ঢাকা ছিল না, ছিল গাছপালায় সবুজ এবং এর জলবায়ুও ছিল উষ্ণ। এখানে এখন অবশ্য যে-রকম শীত, তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

আমাদের দেশে যখন শীতকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গরমকাল। সেই জন্যে অ্যান্টার্কটিকার আসল শীতকাল জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত। তবে যে জায়গা সারা বছরই বরফের তলায় ঢাকা পড়ে থাকে, সেখানে আর শীত-গ্রীষ্মের তফাতটা কী। কিন্তু তাপমাত্রা বিচার করলে তফাত বেশ ধরা যায়। অ্যান্টার্কটিকায় ব্রিটিশ, আমেরিকান, রাশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার জন্যে যে-সব কেন্দ্র তৈরি করেছেন, সেই সব কেন্দ্রের তাপমাপক যন্ত্রে তাপমাত্রার হেরফের ধরা পড়ে। এর মধ্যে পৃথিবীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধরা পড়েছে ভস্টক্ নামক একটি কেন্দ্রে—আগস্ট মাসে শূন্যের চেয়েও ১২৬·৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট কম। মাত্র ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটেই যেখানে জল জমে যায়, সেখানে এই ঠাণ্ডা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। জানুয়ারি মাসেও, অর্থাৎ এখানে যখন গরমকাল—তখনও এখানকার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে ৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট কম থাকে।

মানুষ এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করে না, স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে আছে পেঙ্গুইন, সীল মাছ আর খুব অল্পসংখ্যক পোকামাকড়।

পৃথিবীর দক্ষিণে যে একটি মহাদেশ আছে, এ-কথা বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তারপর তিমি-শিকারিরা জাহাজে করে শিকার করতে এসে এই মহাদেশের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। কে প্রথম এই মহাদেশ খুঁজে বার করেছিল, এ সম্বন্ধে নানা রকম মতবিরোধ আছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে সবচেয়ে প্রথমে গিয়ে পৌছেছিলেন

নরওয়ের অধিবাসী আমুণ্ড্সেন্—১৪ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে। তার কিছুদিন পরেই ১৮ জানুয়ারি ১৯১২ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী স্কট দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে পৌঁছে ফেরার পথে বরফের ঝড়ে সদলবলে মারা গেলেন।



আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

পৃথিবীতে এমন একটি রেখা আছে যার দুদিকে একই দিনে একই সময়ে দুটি ভিন্ন ভিন্ন তারিখ, ভিন্ন ভিন্ন বার—একথা যদি বলা হয় তাহলে হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যি সত্যি বার, তারিখ ও সময়ের হিসেবের সুবিধের জন্যে পৃথিবীতে এই রকম একটা রেখা কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে—যার নাম দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বা ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইন। তারিখের হেরফের হয় বলেই এই নামকরণ। এই রেখাটি ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। পৃথিবী গোল বলে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একটি রেখায় এসে এক হয়ে মিশে গেছে—এই রেখাটিই হল ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা। এটির দুটি নাম থাকলেও রেখাটি আসলে একটাই।

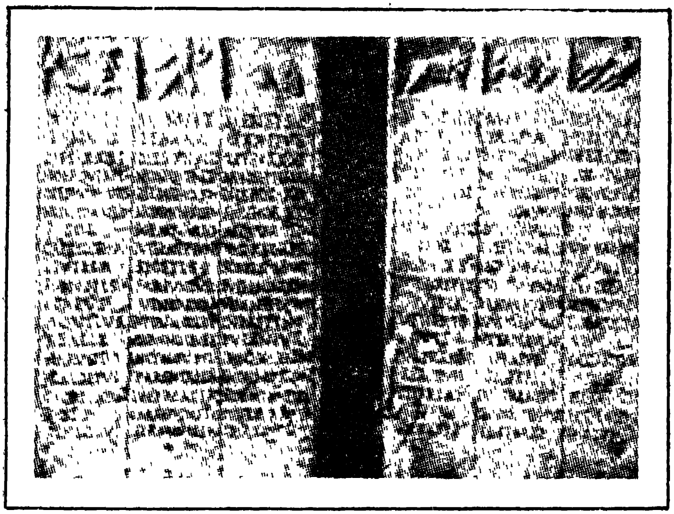
ধরে নেওয়া যাক, দ্রাঘিমা রেখা কাকে বলে তোমরা সকলেই

জানো। পৃথিবীর মানচিত্রে দেখবে উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা লম্বা কতগুলো রেখা আঁকা আছে—ওগুলি অবশ্য সত্যিই পৃথিবীর ওপর আঁকা নেই—সময় এবং অন্যান্য অনেক কিছুর সুবিধার জন্যে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে—এগুলিকেই বলা হয় দ্রাঘিমা রেখা বা মধ্য রেখা। লণ্ডনের কাছে অবস্থিত গ্রীনিচ আবহাওয়া অফিসের ওপর দিয়ে যে মধ্য-রেখাটি গেছে তাকে মূল মধ্য রেখা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এটিকে ধরা হয়েছে শূন্য ডিগ্রি। গ্রীনিচের পশ্চিমে আছে ১৮০টি দ্রাঘিমা বা মধ্য-রেখা। গ্রীনিচের পূর্বে গেলে প্রতি এক ডিগ্রি দ্রাঘিমায় সময়ের বৃদ্ধি হয় চার মিনিট। অতএব ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার সময় হবে গ্রীনিচের সময়ের চেয়ে ১৮০ × ৪ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা বেশি। গ্রীনিচের পশ্চিমে আবার প্রতি এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার সময় কমে যায় চার মিনিট করে। অতএব ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমার সময় হবে ১৮০ × ৪ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা কম। এর থেকেই বোঝা যায়, ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা বা মধ্য-রেখার পূর্ব ও পশ্চিম পাশে সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ১২ + ১২ ঘণ্টার—অর্থাৎ পুরো একটা দিনের। পূর্ব দিকে অর্থাৎ এশিয়ার দিকে সময় একদিন এগিয়ে যায় ও পশ্চিমে আমেরিকার দিকে সময় একদিন পেছিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে একদিন বাড়ে বা কমে। অবশ্য রেখাটির দুপাশে সময় থাকে একই। পূর্বে যদি রাত্রি আটটা হয় পশ্চিমেও হবে রাত্রি আটটা—তফাত থাকবে শুধু কী বার তাই নিয়ে। পূর্ব দিকে অর্থাৎ এশিয়ার দিকে যখন সোমবার ৪ জানুয়ারি, পশ্চিম দিকে অর্থাৎ আমেরিকার দিকে তখন রবিবার ৩ জানুয়ারি। রেখাটি জাহাজে বা প্লেনে পার হতে হয়তো এক মিনিটের বেশি লাগবে না, কিন্তু তার ফলে পার্থক্য ঘটে যাবে পুরো একটি

দিনের।

আসলে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত হলেও সব জায়গাতেই সেই রেখাটি অনুসরণ করে চলা হয়নি। দ্বীপপুঞ্জগুলিকে তারিখ বিভ্রাটের সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্যে লাইনটি পূর্বে ও পশ্চিমে এঁকেবেঁকে গেছে। এই কারণে এই রেখাটি পুরোপুরিই প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে গেছে—কোনো স্থলভূমিকে স্পর্শ করেনি। এই রেখাটি আরম্ভ হয়েছে সাইবেরিয়ার পূর্বতম বিন্দুর পাশে বেরিং প্রণালীর মধ্যে ; জাপান, ফিলিপাইন, নিউগিনি ও নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব দিক দিয়ে গিয়ে এই রেখা শেষ হয়েছে দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে।



ক্যালেণ্ডার

সময়ের হিসেব রাখবার জন্যে মানুষ ক্যালেণ্ডার তৈরি করেছে। পৃথিবীর সব দেশেই ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে দিনের গণনা করা হয়—এমন-কী যে-সব উপজাতীয়দের মধ্যে আজও সভ্যতার আলো ভাল-ভাবে প্রবেশ লাভ করেনি, তাদের মধ্যেও কোনো না কোনো রকমের সময়ের হিসেব রাখার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

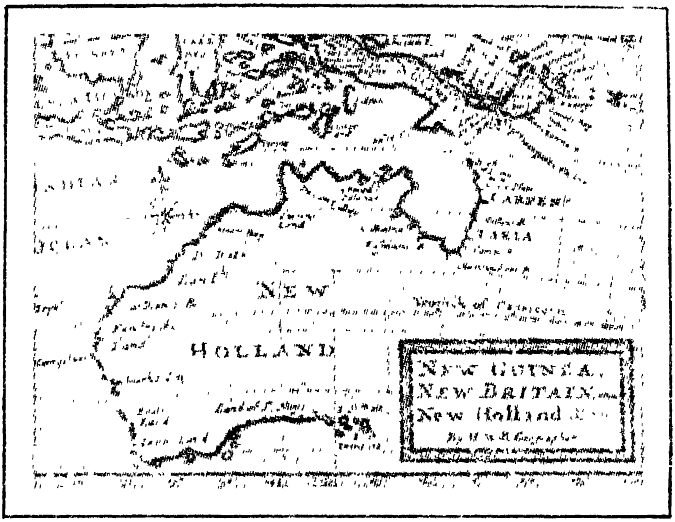
ইউরোপে সর্বপ্রথম ক্যালেণ্ডার তৈরি করেন রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজার যীশু খ্রীষ্ট জন্মাবার ৪৫ বছর আগে। এই ক্যালেণ্ডারকে বলা হয় জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার। তখন তিন শো পঁয়ষট্টি দিনকে এক বছর বলে গণনা করা হত। এই তিন শো পঁয়ষট্টি দিনকে অসমান ভাবে বারো মাসে বিভক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর সূর্যকে

প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন। এই $\frac{১}{৪}$ দিনের কোন হিসেবই রোমান ক্যালেণ্ডার রাখত না। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্যে জুলিয়াস সীজার লীপ্ ইয়ার বা অধিবর্ষের উদ্ভাবন করলেন। প্রতি চতুর্থ বৎসরে ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করা হল।

কিন্তু অধিবর্ষ এইভাবে গণনা করা হলে বছরে ১১ মিনিট ১৪$\frac{২}{৫}$ সেকেণ্ড সময় বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এক হাজার বছরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ হয় এক সপ্তাহ। এই ভাবে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারের গণনায় ঋতু পর্যায়ের সঙ্গে এগারো দিনের তফাত হল। এই তফাত সংশোধন করবার জন্যে রোমের ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগারি এগারো দিন সময় এগিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। এই ৪ঠা অক্টোবরকে ১৫ই অক্টোবর বলে মেনে নেওয়া হল। এই সংশোধিত ক্যালেণ্ডারই এখনও আমরা ব্যবহার করে চলেছি। একে বলা হয় গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডার। ভুল সংশোধনের পরে এখনও হাজার বছর পার হয়নি—সেইজন্যে সময় নিয়েও কোন সমস্যা দেখা দেয়নি আজও। সে সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবেন ৩০০০ খ্রীষ্টাব্দের গণিত-বিশারদরা।

কিন্তু বর্তমান ক্যালেণ্ডার ঋতু পর্যায়ের গণনার কোন বৈষম্য না আনলেও অন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অসমান মাসের বেতন ঠিক করার ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে অনেক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ভারত সরকারের দেওয়া পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছে—বছর হবে ৩৬৪ দিনের। বাড়তি দুটি দিনকে ছুটি বলে গণ্য করা হবে। এই দুটি দিন হল ৩১শে ডিসেম্বর এবং প্রস্তাবিত ৩১শে জুন। ৩১শে জুন তারিখটির পরিকল্পনা করা হয়েছে অধিবর্ষের ২৯শে ফেব্রুয়ারির বদলে। ফেব্রুয়ারি

মাসে একদিন কমিয়ে জুন মাসে একটি দিন বাড়িয়ে দেওয়া হবে প্রতি চতুর্থ বছরে। ৩১শে ডিসেম্বরকে বলা হবে 'পৃথিবী দিবস'। এখনও এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।



মানচিত্রের জন্ম

ভূগোল পড়তে হইলে মানচিত্রের দরকার হয়। কিন্তু মানচিত্র প্রথমে কী ভাবে আঁকা হল সে ইতিহাস হয়তো সকলের জানা নেই। মানুষ লিপির সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করবার আগেই বাসভূমির ছবি আঁকতে শিখেছে। এই ছবি ও নকশাগুলিই পরিবর্তিত হতে হতে পেয়েছে আজকের মানচিত্রের রূপ।

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো মানচিত্র ব্যাবিলনের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া এস্কিমো, ভারতীয়, আজটেক্ ও চীন দেশীয় নকশাগুলিও সভ্যতার আদিযুগেই আঁকা। কিন্তু বর্তমান মানচিত্রের ভিত্তিভূমির কথা স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে গ্রীকদের কথা। এই গ্রীকদের চেষ্টায় মানচিত্র আঁকার খুব উন্নতি হয়েছিল। ষোড়শ

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীকদের মানচিত্রই শ্রেষ্ঠ ছিল। গ্রীকরাই প্রথম নির্ধারণ করেছে পৃথিবীর আকৃতি, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থান, উদ্ভাবন করেছে বিষুবরেখা, ক্রান্তিবলয়, দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা। মানচিত্র আঁকবার প্রথম গাণিতিক প্রণালীও গ্রীকরাই প্রথমে উদ্ভাবন করেছে। পৃথিবীর আয়তন হিসাব করবার প্রচেষ্টা গ্রীকরাই করেছে সর্বপ্রথম। কিন্তু মানচিত্র আঁকায় গ্রীকদের এই উৎসাহ প্রসিদ্ধ ভূ-বিজ্ঞানী টলেমির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে আসে। টলেমির আঁকা ম্যাপ সাধারণ গ্রীক ম্যাপের চেয়ে একটু অন্য ধরনের। এই ম্যাপে পৃথিবীকে চতুষ্কোণ ও সমতল দেখান হয়েছে।

বিখ্যাত ভৌগোলিক টলেমির মৃত্যুর পর রোমান মানচিত্র প্রাধান্য লাভ করল। কিন্তু রোমানদের ম্যাপে বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। এই মানচিত্রগুলি আঁকা হয়েছিল সামরিক বিজয়ের অভিলাষে। গ্রীকরা স্থির করেছিল পৃথিবী গোলাকৃতি। এ কথা ভুল মনে করে রোমানরা আবার আগেকার বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীকে সরার মতো করে আঁকতে থাকে। মধ্যযুগের মানচিত্রগুলিতে সেইজন্যে পৃথিবীকে সরার মতোই দেখান হয়েছে।

ক্রিশ্চানদের উদ্ভাবিত ম্যাপগুলি বাইবেলের নির্দেশ অনুযায়ী আঁকা। এগুলিতে সত্যের নিদারুণ বিকৃতি ঘটেছে। সরাকৃতি পৃথিবীর ঊর্ধ্বাংশ জুড়ে এশিয়া, নিম্নাংশে ইউরোপ ও আফ্রিকা। পৃথিবীর উত্তর সীমান্তে আদম-ইভের ছবি-সম্বলিত স্বর্গরাজ্য। মাঝখানে জেরুজালেমের চিত্র।

ইউরোপের এই অধঃপতনের সময় আরব দেশ মানচিত্র আঁকায় বেশ উন্নতি করেছিল। টলেমি রচিত 'জিওগ্রাফিয়া' নামক বইটি আরবদের কাছে সে সময়ে খুবই প্রিয় ছিল। ক্রিশ্চানদের অন্ধবিশ্বাস

তাদের মন স্পর্শ করতে পারেনি। ক্রমশ ইউরোপেও বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে আঁকা ম্যাপের সত্যতা সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মনে সন্দেহ এল। চতুর্দশ শতাব্দীতে আঁকা ক্যাটালান অ্যাটলাস বাই-বেলের নির্দেশ অনুসারে আঁকা হয়নি।

এর পরে ইউরোপে ওলন্দাজদের আঁকা মানচিত্রর খুব নাম হল। এই ওলন্দাজ মানচিত্রের জনক হিসাবে প্রথমেই মনে পড়ে ষোড়শ শতাব্দীর মারকেটারের নাম। ইনি পৃথিবীর যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তাতে ভুল খুব কমই পাওয়া যায়। টলেমির আঁকা ম্যাপেরও ইনি যথেষ্ট সংশোধন করেছিলেন। এছাড়া তাঁর উদ্ভাবিত মারকেটার প্রোজেকশান পদ্ধতি আজও সমস্ত পৃথিবীতে মানচিত্র আঁকার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। ম্যাপ আঁকা এই সময় ওলন্দাজদের একটি লাভজনক ব্যবসা হয়ে ওঠে। কিন্তু ওলন্দাজ ম্যাপের সবচেয়ে বড় ত্রুটি—ভুল তথ্যের সমাবেশ। পৃথিবীর অজানা স্থানগুলি শূন্য রাখলে ম্যাপের বিক্রি বেশি হত না, কাজেই ওলন্দাজ ম্যাপনির্মাতারা সেই সব শূন্য স্থান নানারকম ভ্রান্তিকর চিহ্ন দিয়ে পূর্ণ করতে লাগল। অজ্ঞাত আফ্রিকার বুকে হাতির ছবি প্রায়ই দেখা যেত। ম্যাপের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান এইরকম জীবজন্তু দিয়ে পূর্ণ করা হত এবং ফুটনোটের সাহায্যে অজস্র কল্পিত তথ্য পরিবেশন করা হত।

ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ম্যানসন্, জ্যালিয়ট, প্রভৃতির আঁকা ম্যাপে ওলন্দাজ ম্যাপের চেয়ে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেকগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের আবির্ভাব হওয়ায় মানচিত্র নির্মাণের উদ্যম খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সামরিক বিজয়ের জন্যে নির্ভুল মানচিত্র খুবই দরকার। সেইজন্যে এই সময়ে প্রতিটি রাষ্ট্রই ব্যস্ত হয়ে মানচিত্র তৈরি

করতে আরম্ভ করে।

কিন্তু দেশ জরিপের ব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত হয় ফ্রান্সে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভূখণ্ডকে ত্রিভুজ আকারে জরিপ করবার প্রচেষ্টা চালালেন ক্যাসিনি ও থুরি। জরিপের মানচিত্র দেখে সম্রাট পঞ্চদশ লুই সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত ফ্রান্সের এই রকম মানচিত্র নির্মাণের আদেশ দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই দুর্যোগ দেখা দিল। রাষ্ট্রের টাকা কড়ির টানাটানির জন্যে প্রথম মানচিত্র ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাসিনির কাছে জরিপের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ এল। ক্যাসিনি আশা ছাড়লেন না। চাঁদা তুলে ও নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি জরিপের কাজ চালিয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্যবশত সম্পূর্ণ ম্যাপ আঁকা শেষ হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর আরম্ভ করা কাজ শেষ করলেন তাঁর ছেলে।

ক্যাসিনির আঁকা ফ্রান্সের ম্যাপই সত্যিকারের প্রথম আধুনিক মানচিত্র। বাইবেলের অন্ধবিশ্বাস ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীবুদ্ধি ঝেড়ে ফেলে তিনি মানচিত্রকে দিলেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকার। ক্যাসিনির ম্যাপ দেখে উৎসাহিত হয়ে নেপোলিয়ান ইটালির ম্যাপ তৈরি করালেন। এছাড়াও জার্মানি, গ্রীস ও ইজিপ্টেও তিনি উল্লেখযোগ্য জরিপের কাজ করিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশ-গুলিও এই সব দেখে জরিপের কাজ আরম্ভ করে দিল। এই রকম ভাবে দেশে দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মানচিত্র আঁকার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।



টোর্নাডো

তোমরা নিশ্চয় ঘূর্ণিঝড় দেখেছ। বিশেষ করে গরম কালে যখন দুপুরবেলায় তাপমাত্রা ভীষণ বেড়ে যায় তখন বিকেলবেলার দিকে যে ধুলোর ঝড় হয় উত্তর ভারতে যাকে বলা হয় 'আঁধি' সে ঝড়ের সঙ্গে তোমরা সকলেই পরিচিত। পৃথিবীতে এই ধরনের আরও অনেক ঘূর্ণিঝড় আছে—তাদের মধ্যে একটির নাম 'টোর্নাডো'। এই ঘূর্ণি ঝড়ে হাওয়ার গতিবেগ খুবই বেশি থাকে এবং তারপরই শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। প্রথমে আকাশে 'ফানেল' আকারের একটা মেঘ দেখা দেয়। তারপর জেট্ বিমানের মতো প্রবল শব্দ করে একটা ঝড় হয়ে 'টোর্নাডো' মাটিতে নেমে আসে। বায়ুর গতিবেগ এত তীব্র হয় যে, যা কিছু সামনে পড়ে টোর্নাডো সব কিছুই ধ্বংস করে ফেলে। এই ঝড় উত্তর আমেরিকাতেই বেশি হয় এবং প্রতি বছরেই এই ঝড়ে

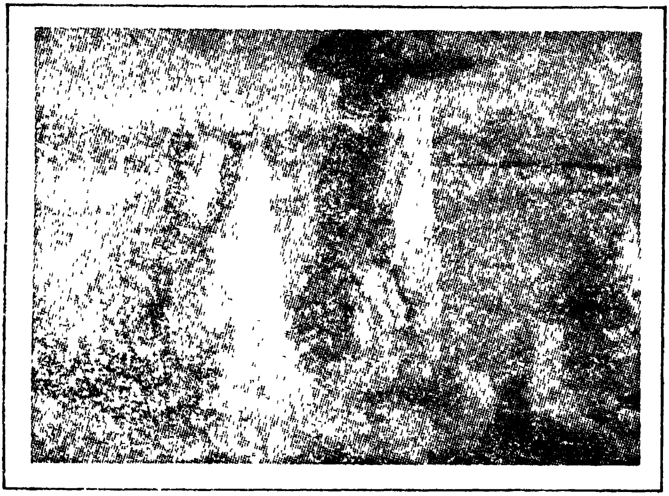
হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। মোটা মোটা গাছ একেবারে ভেঙে তুমড়ে-মুচড়ে ফেলে এই ঝড় গরু-বাছুর এমন-কী মোটর গাড়ি পর্যন্ত হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে।

যদিও টোর্নাডো ঝড় প্রায়ই হয় না তবু উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর আর সব জায়গাতেই এই ঝড় সৃষ্টি হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে সাধারণত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই এই ঝড় প্রবল আকারে দেখা দেয়। প্রতি বছরে এখানে ৬০০ থেকে ৭০০ বার টোর্নাডো ঝড় হয়। উত্তর আমেরিকার মাঝখানের সমতলভূমিতেই এই ঝড় বেশি হয় এবং সেই জন্যে এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে, 'টোর্নাডোর বন্ধু' বা 'টোর্নাডো অ্যালি'। এই ঝড় বছরের যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো ঋতুতে উঠতে পারে—রাত্রিতে বা দিনের বেলা যে কোনো সময়ে—এর কোনোই স্থিরতা নেই। কিন্তু সাধারণত বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে এবং বিকেলবেলায় বা সন্ধ্যাবেলায় এই ঝড় হঠাৎ প্রবল আকারে দেখা দিয়ে তার তাণ্ডব নাচ শুরু করে। এই ঝড় বয় মাত্র কয়েক মিনিট ধরে এবং যে জায়গাটি এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা চওড়ায় মাত্র একশো ফুটের মতো এবং লম্বায় কয়েক মাইল। অবশ্য কোনো কোনো প্রবল টোর্নাডো ঘণ্টাখানিক ধরে বইতে থাকে এবং এগুলির গতিপথ এক মাইল চওড়া এবং কয়েক শো মাইল লম্বাও হয়। ঝড়ের সময়ে যে 'ফানেল' আকৃতির মেঘ সৃষ্টি হয় তা সাধারণত পূর্ব দিকে বেঁকে থাকে এবং ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে বইতে থাকে। কিন্তু ফানেলের মধ্যে যে ঘূর্ণিটির সৃষ্টি হয় তার গতিবেগ ঘণ্টায় ২০০ থেকে ৬০০ মাইল।

টোর্নাডো ঝড়ের উৎপত্তি কেন হয় সে সম্পর্কে নানান বৈজ্ঞানিকের

নানান মত। এই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় শিলাবৃষ্টিও হতে থাকে, বজ্রের কড়কড়ানি এবং বিদ্যুতের ঝলকানি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মনে হয় সমস্ত সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে। টোর্নাডো আসবার মতো আবহাওয়া দেখা দিলে আবহাওয়া অফিস থেকে বিপদ সংকেত জানিয়ে দেওয়া হয়। এই ঝড়ের একটি লক্ষণ হল মাটির কাছাকাছি থাকে গরম আর্দ্র হাওয়া এবং উঁচুতে থাকে ঠাণ্ডা হাওয়া —আর তার গতিবেগও হয় প্রবল। যখনই প্রকৃতিতে ফানেল আকৃতির মেঘ এবং আবহাওয়া অফিসের র‍্যাডার যন্ত্রে টোর্নাডোর আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—তখনই রেডিওতে লোকেদের কোনো নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার কথা ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

অনেক বৈজ্ঞানিক টোর্নাডো ধ্বংস করবার জন্যে রকেট, বন্দুকের গুলি অথবা বিস্ফোরকের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছেন। ঝড় প্রতিরোধের জন্যে কিছু গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছে। কিন্তু এগুলির কোনোটিরই ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনও সম্ভব হয়নি এবং টোর্নাডোকে এখনও পর্যন্ত মানুষের আয়ত্তে আনা যায়নি—তার ধ্বংসকার্য উত্তর আমেরিকার সমতলভূমিতে আজও সমানভাবে চলেছে।



মৃত সাগর

পৃথিবীতে এমন একটা আশ্চর্য সাগর আছে যার নাম তোমরা শুনেছ কিনা জানি না—মৃত-সাগর বা ডেড্ সী। এই সাগরটি যেখানে অবস্থিত সেখানে বৃষ্টিপাত খুবই কম—এই জন্যে অনেকে একে মরু-সাগরও বলে থাকেন। এই মৃত-সাগরটি আছে ইজরায়েল ও জর্ডান রাজ্যের মধ্যে—জেরুজালেম শহর থেকে ১৫ মাইল বা ২৪ কিলোমিটার পশ্চিমে। জর্ডান নদী এই সাগরে এসে মিশেছে। এই সাগর উত্তর থেকে দক্ষিণে ৪৬ মাইল বা ৭৪ কিলোমিটার লম্বা এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে চওড়া ১৬ কিলোমিটার। তাহলে এর আয়তন হল ৩৬০ বর্গ মাইল বা ৯৩০ বর্গ কিলোমিটার। এই সাগরটি খুবই গভীর। এর গড় গভীরতা ১,০০০ ফুট বা ৩০০ মিটার। সবচেয়ে গভীরতম অংশে এর গভীরতা ১,৩১৫ ফুট বা ৪০১ মিটার। এই

সাগরের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই সাগরটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১,৩০০ ফুট বা ৩৯৬ মিটার নিচুতে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু অংশে অবস্থিত একটি সাগর।

এই মরু সাগরের জলে লবণের পরিমাণ খুব বেশি। কারণ এই সাগরের জল কোথাও বেরিয়ে যেতে পারছে না। প্রায় বৃষ্টিহীন অঞ্চলে এই সাগর অবস্থিত—সেইজন্যে বৃষ্টির জল এসেও এতে মেশে না। সূর্যের প্রখর তাপে সাগরের জল গড়ে প্রতিদিন ½ ইঞ্চি পরিমাণ বাষ্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জলের লবণ তো বাষ্পে পরিণত হতে পারে না—কাজেই লবণের অংশ থেকেই যাচ্ছে সাগরে। যে পরিমাণ জল বাষ্প হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন সেই পরিমাণ টাটকা জল এসে এই সাগরে মিশছে না। সেই জন্যে মরু-সাগর বা মৃত-সাগর পৃথিবীর সবচেয়ে লবণাক্ত হ্রদগুলির মধ্যে একটি। কোনো কোনো অংশে এই জলে লবণ এত বেশি হয়ে গেছে যে, জলে আর লবণ গলতে পারে না, জমা হয়ে যেতে থাকে। এখানে জলের উপরের অংশে প্রতি লিটার জলে ২২৭ থেকে ২৭৫ গ্রাম করে লবণ আছে এবং ৩৬০ ফুট বা ১১০ মিটার গভীরতায় এই লবণের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে প্রতি লিটারে ৩২৭ গ্রাম হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই সব লবণের অনেকটাই খুব সাধারণ লবণ হলে ও এখানকার লবণের কোনো কোনো অংশে যে পটাসিয়াম আর ব্রোমাইড পাওয়া যায় সেগুলির বেশ দাম আছে। গরমকালে এক এক সময় এই অঞ্চলে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে ১২৪ ফারেনহাইট বা ৫১ সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যায়। তোমরা হয়তো ভাবছ এই সাগরের বিবরণের মধ্যে বৈচিত্র্য কী আছে। কিন্তু এই সাগরের রহস্যের কথা এইবার বলছি। এই সাগরের জল লবণে লবণে এত ঘন হয়ে গেছে যে, কেউ সাঁতার না

জানলেও এই সাগরের জলে ডুববে না—লবণের উপর ভেসে থাকবে।

তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে এই সাগরের নাম মৃত-সাগর বা ডেড্ সী তার কারণ হল এই যে—এর জলে লবণ এত বেশি যে, কোনো প্রাণীই এর জলে বাঁচতে পারে না—একমাত্র কিছু জীবাণু ছাড়া। জর্ডান নদীর জল যে-সব মাছ ধরে নিয়ে আসে এই সাগরে, তারা এই সাগরে এসেই এর লবণতার জন্যে মরে যায়। এখানে কোনো প্রাণী বাঁচে না বলেই এই সাগরের নাম রাখা হয়েছে ডেড্ সী বা মৃত-সাগর।



অরোরা বোরিয়ালিস

উত্তর মেরুর আকাশে যে আলো দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় অরোরা বোরিয়ালিস। আরোরা বোরিয়ালিস একটি লাতিন কথা, যার মানে হল 'উত্তরের উষা'। উত্তর আমেরিকায় আলাস্কার উত্তর অংশে, হাডসান উপসাগরের মধ্য ভাগে এবং ল্যাব্রাডোরে এই আলো দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপ ও এশিয়ায় এই আলো নরওয়ে ও সুইডেনের উত্তর দিক থেকে আরম্ভ করে একেবারে

সাইবেরিয়ার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এই আলোকে বলা হয় মেরু-জ্যোতি। যখন উত্তর মেরুর আকাশে সূর্য ওঠে না তখন এই আলোই পৃথিবীর উত্তর অংশকে আলো দেয়। এই আলোর রং বদলে যেতে থাকে। উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও এই আলোকে হলুদাভ সবুজ দেখায়, কখনও লাল, কখনও কমলা এবং গোধূলিতে কখনও কখনও বা বেগুনি।

এই আলোর আকৃতি প্রায়ই বদলাতে থাকে। কখনও এই আলো অর্ধবৃত্তের মতো মনে হয়। তখন এই আলো উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল চওড়া হয় এবং পূর্ব-পশ্চিমে এর বিস্তৃতি হয় হাজার হাজার মাইল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল উঁচুতে এই আলো দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও অরোরার আরও নানা রকম আকৃতি হতে পারে। কখনও এর আলোগুলো দেখায় সমান্তরাল রশ্মির মতো, কখনও বা আলোর শিখাগুলো জ্বলতে থাকে। কখনও কখনও অরোরাকে দেখায় একটা পর্দার মতো, কখনও বা ওড়নার মতো, কখনও বা পাখার মতো। এই আলো দক্ষিণ মেরুতেও দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ মেরুতে এর নাম অরোরা অস্ট্রালিস— লাতিন ভাষায় যার মানে হল 'দক্ষিণের উষা'।

সূর্যের আলো এবং পৃথিবীর চৌম্বকীয় আকর্ষণের সঙ্গে এই আলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং হাই-ড্রোজেনের কণার প্রতিফলনের জন্যেই এই আলোর উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। এইগুলির সাহায্যেই আলোতে রঙের সৃষ্টি হয় বলে অনুমান করা হয়েছে। অরোরার উৎপত্তি কী ভাবে হল এ সম্পর্কে কৌতূহল মানুষের মনে বহু শতাব্দী আগে থেকেই জেগেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা সুরু হয়।

তারপর অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান চলতে থাকে। নানা দেশের লোকেরা এ বিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন। রাশিয়াতে মিখাইল লসনমভ্, ইংল্যাণ্ডে জন ক্যাণ্টন এবং আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এ বিষয়ে গবেষণা চালান।

এ বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে, অরোরার আলোর উৎস সূর্য। ৬৫° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮০° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এই আলো সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে এই আলো সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। এই আলো যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল থাকে তখন পূর্ণিমার মতো আলো হয়। যখন এই আলোর উজ্জ্বলতা কমে যায় তখন আর এর মধ্যে কোনো রঙ দেখতে পাওয়া যায় না। বছরে ২৫০ বার এই আলো দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর মেরু বিন্দুর কাছাকাছি চলে গেলে অর্থাৎ আলাস্কার মধ্যভাগ, জেমস বে, দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, উত্তর নরওয়ে এবং সাইবেরিয়ার উপকূলের আরও উত্তর দিকে গেলে এই আলো বারবার দেখতে পাওয়া যায় না এবং এই সব অঞ্চলেব দক্ষিণেও এই আলোর প্রকাশ কমে যায়। কিন্তু কখনও কখনও দক্ষিণের কোনো কোনো অঞ্চলে কয়েক ঘণ্টা ধরে এই আলো দেখা যায়। দশ বছরের মধ্যে একবার এই আলো মেক্সিকো, কিউবা এবং দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত দেখা যায়।

—